

বেপারোহা

শিশু-উপন্যাস



শ্রীঅখিল নিয়োগী

জন্মাস্টমী—১৩৩৫

সোল এজেন্ট—

কুলজ্ঞ সাহিত্য-মন্দির

৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

দাম এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅখিল নিয়োগী

৩০নং ওয়েলিংটন স্ট্রীট,

কলিকাতা।

৪৭১৫৫৩
৩০৪
৮২৮
০৬/০২/২০০৭

—এই লেখকের—

বামনামা	-	-	১৫/০
পন্নীর দৃষ্টি	-	-	১৫/০
অশ্বিন-পুরী	-	-	৫০
বাম্পাদিত্য	-	-	১৫/০

সকল প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

প্রিন্টার—শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬নং চালতা বাগান লেন,
কলিকাতা।

দু'টি কথা

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজকুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে বেপরোয়া ধারাবাহিক ভাবে :৩৩৪ সনে শিশু-সাথীতে বেরিয়েছিল।

সেই সময়ই লেখাটার ওপর ছেলেদের একটা বিশেষ দৃষ্টি দেখে আমার অনেক সাহিত্যিক বন্ধু এটাকে পুস্তকাকারে বের করতে অতুরোধ করেন।

তারই ফলে আমার হাতে এই প্রথম শিশু-উপন্যাসের জন্ম।

বইখানা লিখতে আমার বন্ধু 'খোকাখুকুর' স্বেচ্ছায় রূপকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দত্ত, শিল্পী বন্ধু শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এবং শ্রীযুক্ত বিনয় সেনগুপ্তের কাছ থেকে নানা ভাবে সাহায্য পেয়েছি।

তা ছাড়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কবি বন্ধু শ্রীযুক্ত স্থনির্মল বসুর অবাচিত দানও নেহাৎ কম নয়।

আজকের দিনে তাঁদের কথা আমার বিশেষ ক'রে মনে পড়ছে।

আর সব চাইতে বেশী মনে পড়ছে বাঙলার ভাই-বোনদের হাসি-খুসী মাথা মুখ—যাদের আগ্রহ না পেলে আমার এ শিশু-উপন্যাসের প্রচেষ্টা বোধ করি শিশু-সাথীর পাতাতেই আটকে থাকত।

৩০নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

}

শ্রীঅখিল নিস্কোপী

শ্রীমুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

সাহিত্যভূষণ,

হুপ্রিয়েষু,—

বন্ধু,

নিছক সাহিত্য-সাধনার জন্তে বে দিন এক কপর্দকও হাতে না নিয়ে, নিতান্ত নিঃশ্বেদ মতো তোমার বেপরোয়া কর্মজীবন শুরু করেছিলে...সে দিন তোমার এই সখ্য-গর্বিত বন্ধুটি তোমার পাশে থাকবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

আজ সেই পবিত্র দিনটির কথা স্মরণ ক'রে আমার “বেপরোয়া” তোমার বেপরোয়া জীবনের সঙ্গে এক সূত্রে গেঁথে দিয়ে ধন্ত হলাম।

ইতি-

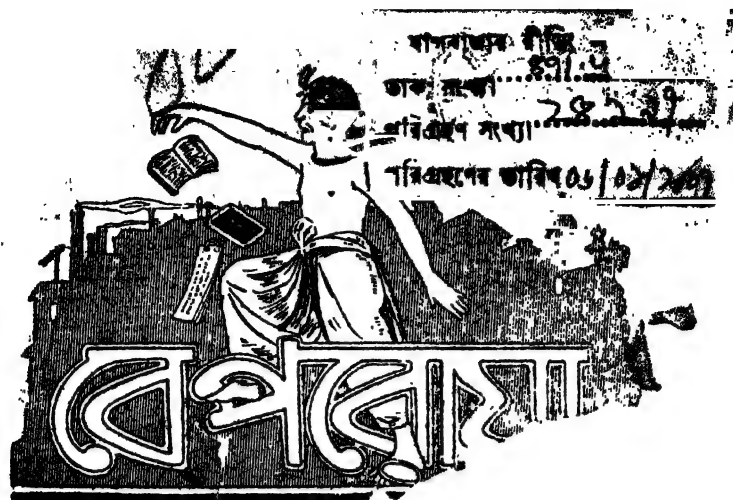
তোমার

নিম্নোপী



স্বাক্ষর

নারীর দায়ের খুলে খাড়া পথে অন্ধর কনচ হয়ে থাকবে।



পৌষের প্রথমটা
সবে বাৎসরিক
কোন ছুটি
মীন কাঁচাপ
ভেতর থেকে
কি কলি

বেশারিয়া

ধরা পড়ে গেলুম। কোচড়েও যে ডজন-দুই আধপাকা
পেয়ারা জমা রেখেছিলুম তা আর মনে ছিল না। মা আঁচল



দিদির ছেলে টিক্‌টিকি একটা আস্তো পেয়ারা মুখে শূরে দিলে। মা হাঁ-হাঁ করে তাকে ধরতে যেতেই সুযোগ বুঝে আমি একছুটে পড়বার ঘরে এসে ভূগোলখানা খুলে চোঁচিয়ে পড়তে শুরু করে দিলুম—“রংপুর—অ্যা—রংপুর—রংপুর—জেলার প্রধান নগর রংপুর—তামাকের জন্ম বিখ্যাত—”

এমন সময় মা হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে বল্লেন, “ছেলের পড়ার চাড়া দেখ না—যা, তোকে পড়তে হবে না, একখানি গাড়ী ডেকে আন দেখি শীগ্‌গীর।”—হাঁ করে মার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। খুব একটা বড় রকম শান্তিরই আশঙ্কা কচ্ছিলুম, এমন সময় কি না গাড়ী ডাকতে হবে!

একটু সাহস পেয়ে নান্দে জড়িয়ে ধরে বল্লুম, “কোথায় বেড়াতে যাবে মা?”

মা বল্লেন—আমার ছেলে বেলার সই এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে যাবার কথা আছে। গাড়ী ডেকে যখন মার সইয়ের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলুম তখন বিকেল হয়ে গেছে।

গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। বাইরের ঘরে কেউ নেই, তারপর একটা সরুগলি পেরিয়ে ভেতরের উঠানেতে ঢুকতেই দেখতে পেলুম ঠিক মার বয়সী আর আমার মেজদির বয়সী ছ’জন মেয়ে রোদে পিঠ দিয়ে বসে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে।

বন্ধুত্ব

বয়সে যিনি বড়, আমাদের পায়ের শব্দ শুনে তিনি হাসি চেপে—উঠে মাকে দেখে অবাক হয়ে বলেন—একি বাসন্তী যে !

মা বলেন, হাঁ, তোরা এখানে এয়েছিস্ শুনে দেখতে এলুম—তোর বিয়ের পর তো ছাখা শুনো নেই।—তবু ভাগি চিন্তে পেরেছিস্ ! আমি ভাবছিলুম বুঝি চিন্তেই পারবিনে। মার সই হেসে বলেন—তা বই কি, তোরাই শুধু চিন্তে পারিস্ আমরা বুঝি ভুলে যাই ?

মেজদির বয়সী মেয়েটী হাঁ করে মার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মার সই বলেন,—অরুণা নমস্কার কর, তোর মাসিমা হয় যে ! মেয়েটী মার পায়ে প্রণাম করলে। মার চোখের ইসারায় আমি আর মেজদিও তাঁকে নমস্কার করলুম। মা আমাদেরও বলে দিলেন—এঁকে মাসিমা বলে ডেকো—বুঝলে ?

মাসিমা বলেন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? বোস্ না বাসন্তী ! তারপর সেই মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলেন—যা তো মা অরুণা, তোর মাসিমার বোস্‌বার জুন্ত একটা আসন এনে দে।

মা বলেন—তা না হয় বস্‌ছি। কিন্তু তোরা এত হাসা-হাসি কচ্ছিলি কেন বল্ দেখি ? মাসিমা আবার ফিক্ করে হেসে ফেলেন ; বলেন—ও আমার ছোট ছেলে নাড়ুর কাণ্ড !

অরুণদি আসন নিয়ে ফিরে আসতে, মা তার হাত থেকে আসনটা টেনে নিয়ে বসে বসেন—কি কাণ্ড করেছে নাড়ু ?

মাসিমা মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপতে চাপতে দেয়ালের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলেন ঐ যে—চেয়ে দেখি দেয়ালের এ মাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত কাঠ কয়লা দিয়ে আঁকাবাঁকা অঙ্করে কে লিখে রেখেছে—“আর একবার সাধিলেই খাইব।”

মা হাসতে হাসতে মাসিমাকে জিজ্ঞেস করলেন—সে আবার কিরে ?

মাসিমা বলেন—এখানে একজিবিসন্ হচ্ছে না কোথায় ? সকাল বেলা উঠে ও বসে—বেলা আটটার মধ্যে ভাত চাই ; খেয়ে দেখতে যাবে। শীতের সকাল অত শিগ্গীর কি আর রান্না হয় ? তাই বাবুর হ’ল রাগ। না খেয়েই একজিবিসন্ দেখতে গেল। ফিরে আসতে আমি ও অরুণ কত সাধাসাধি—নাঃ খাবে না—এইতো আমাদের খাওয়ার আগেও কত ডেকে গেলুম—কিছুতেই এল না। তারপর আমরা খেতে গেছি, কোন্ কাঁকে এসে গোদা-গোদা অঙ্করে ঐ যে লিখে রেখে গেছে !

সব শুনে আমরা তো হেসে খুন—ভারি মজার লোক তো !

মাসিমা অরুণ দিদিকে ডেকে বলেন—যাতো অরুণ, ওর

বেশ পরোক্ষ।

খাবারটা আলাদা করে ঢেকে আয়—অরুণ দি ততক্ষণ মেজদির সঙ্গে ভাব করে খুব গল্প জমিয়ে তুলেছে। মাসিমার ডাকে মুখ না ফিরিয়েই বলে—রেখেছি, রান্নাঘরে ঢেকে, খাবে—’খন।

মেজদি অরুণদির সঙ্গে গল্প কচ্ছে—আজকাল কি প্যাটার্ণের চুড়ির আদর বেশী। মেয়েদের ধরণই ঐ, দেখা হলেই চুড়ির গল্প, ব্লাউজের গল্প! যখন আর কিছু বলবার থাকে না—তখন কি দিয়ে ভাত খেয়েছিস্ ভাই—কি রান্না হয়েছিল তোদের—এমন তরো, ছু-উ-উ—চক্ষে যা দেখতে পারি না তাই!

এদিকে চেয়ে দেখি মা আর মাসিমাও কম নন। তাদেরও গল্প চলছে ছেলে বেলায় আম বাগানে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁচা আম খাওয়ার কথা—পুতুলের বিয়ে—এমন আবোল তাবোল কত কি! উইয়ের চিপির মাথাটা ভেঙ্গে দিলে সব উই যেমন কিলবিল করে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে—খোলা রাস্তা পেয়ে মা আর মাসিমার গল্পের খারাও ঠিক তেমনি ক্রমাগত একটীর পর একটা বেরিয়ে আসতে লাগল। আমি এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলুম ভাব করি এমন তরো কেউ নেই। তাই হাঁ করে মাসিমাদের গল্প গিলতে লাগলুম। এমন সময় খুট করে একটা শব্দ হতেই পেছন ফিরে দেখি—

প্রায় আমার বয়সীই একটি ছেলে পা টিপে টিপে রান্না ঘরের শেকল খুলে ভেতরে ঢুকছে।

মা কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাসিমা চোখের ইসারায় তাঁকে বারণ করলেন।

কাউকে আর কিছু বলতে হ'ল না। যুহুর্ড পরেই ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে এসে হাত পা ছুড়ে বলতে লাগলো—আমি খাবো না—কিছুতেই খাবোনা,—কেন? কেন বললে ডিমের ডালনা রেখেছি—চিংড়িমাছ ভাজা রেখেছি—তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে—ঐ পোড়ামুখী ছোড়দি বুঝি সব খেয়ে নিয়েছে?

অরুণদি এইবার তার গহনার গল্প ধামিয়ে বললে—হ্যাঁ আমি খেয়েছি? আমি তোরটা খেতে যাব কেন রে?

তবে কোথায় গেল আমার ডিমের ডালনা—দে শীগগীর আমার চিংড়ি ভাজা—বলে ছেলেটি ছম্ ছম্ করে পা ঝেলে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল।

মাসিমা উঠে গিয়ে তার হাত ধরে বসিয়ে গায় মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—আজ তো ফুরিয়ে গেছে, আর একদিন করে দেবো'খন।

নাড়ু মাথা নেড়ে বললে—হুঁ তা বৈ'কি—ফুরিয়ে গেছে? আমায় ঝাঁকি দিয়ে খাওয়াবার জন্তে—তারপর হঠাৎ, নাঃ—

বেশকোরা

আমি খাবো না—কিছুতেই খাবো না—বলে চৈঁচিয়ে উঠে,
এক ছুটে মাসিমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

মাসিমা কিক্করে হেসে ফেলেন।

মা শুধোলেন—একি ছেলেরে তোর? মাসিমা হাসতে
হাসতে বলেন,—“ওই রকমই।”

“তা ইনিই বা কম কি, এই তো পেয়ারা গাছ থেকে টেনে
নাবিয়ে নিয়ে এলুম”—এই বলে মা আমার দিকে তাকালেন।
মাসিমা তাঁর বুকের কাছে টেনে নিয়ে আমায় বলেন—সত্যি
নাকি রে? তা’হলে তোদের ছটিতে মিলবে ভালো।

আমি মাসিমার বুকে মুখ গুঁজে চোক পিট পিট কন্ডে
লাগলুম—সত্যি নাড়ুকে আমার ভারি ভাল লেগেছিল।

মা বলেন—বাইরে থেকে নাড়ুকে ডেকে নিয়ে আয়।

আমিও তাই চাই। নাড়ুর সঙ্গে ভাব করতে আমার
সমস্ত মনটা বলুগা-ছাড়া ঘোড়ার মত ছুটোছুটি করে
বেড়াচ্ছিল। পা টিপে বাইরের ঘরে গেলুম। গিয়ে দেখি
দরজার দিকে পেছন দিয়ে নাড়ু পা দোলাতে দোলাতে আপন
মনে বলছে—কেন আমায় মিথ্যে বলে খাওয়াতে চাইলে—
সেই জন্তাই তো আমার রাগ হ’ল।

ছোড়দি পোড়ামুখী আমার খাবারগুলা খেয়ে নিলে কেন?
আর যদিই বা খেয়ে থাকে তবে অমন করে চৈঁচিয়ে উঠল

কেন? ভাল করে বলো আর আমি খেতুম না?—অভিমানের
তাহার চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল গড়াতে লাগলো।

আন্তে আন্তে বল্লম,—“ডাকছে।” সে বোধ হয় আমার



আন্তে আন্তে বল্লম “ডাকছে”

কথা শুন্তে পেলো না, জানালার কাঁক দিয়ে জল ভরা চোখ

বেশপনোয়া

ছটা তুলে রাখলে। আবার ডাকলুম—“মাসিমা ডাকছে যে”—আমার সাড়া পেয়ে ফস্ করে আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে ফেলে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—কি—?”

আমি সেই কথাই আবার বল্লুম। নাড়ু আস্তে আস্তে কাছে এসে আমার হাত ধরে বললে—বোস। তার পাশে বসলুম। সে বললে তোর নাম কিরে? “নীলে”。 আবার বললে আমার নাম তো শুনেছিস? ঘাড় নেড়ে জানালুম, হ্যাঁ।

নাড়ু বললে আজ যে মার সইয়ের আসবার কথা ছিল, তুই সেই বাসা থেকে আসছিস বুঝি? আমি বল্লুম আমার মা-ই তোমার মার সই। নাড়ু বললে—ও বুঝেছি।

খানিকক্ষণ সে চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠলো আজকে আমার কাণ্ড দেখে কিছু মনে করিস্ নিতো?

আমি হাসি চেপে বল্লুম—কি কাণ্ড? খুব সংক্ষেপেই জবাব দিলে—এই যা সব দেখলি? বল্লুম, না আমার ও সব বড় ভাল লাগলো। এইবার নাড়ু খিলখিল করে হেসে বললে—হ্যাঁ মাঝে মাঝে আমি ও রকম করি রে—কিছু মনে করিস্ নি।

ও বাসা থেকে ফেরবার সময় নাড়ু আমায় এক কোণে ডেকে নিয়ে বললে, মাঝে মাঝে আসবি তো আমাদের বাসায়? বড্ড একলা রে আমি—ভালো লাগে না।

আমি ঘাড় নেড়ে গাড়ীতে উঠলুম

তার পর প্রায় মাস খানেক নাড়ুর আর কোন খোঁজ
খবর পাইনি। সেদিন খাবার সময় কথায় কথায় মা বলেন—
নাড়ুতো তোদের ইঙ্কলে ভর্তি হবে রে। আমি জিজ্ঞেস্



টাকওয়ালা মাথাটা আঁকবার চেষ্টা করছি—পৃঃ ১২

করলুম—কবে গিয়েছিলে ওদের বাসায়! মা বলেন, তোর
মেজদি এসে যে বলে। ও প্রায়ই ও বাসায় যায় কিনা।

বেশপেরোয়া

এর দুদিন পরের কথা বলছি। আঁকের ক্লাশের পেছনের বেঞ্চিতে বসে বুড়ো মাষ্টারের ইয়া বড় টাকওয়ালা মাথাটা আঁকবার চেষ্টা করছি—এমন সময় সিধু বাইরে থেকে ঘুরে ফিরে এসে সংবাদ দিলে আমাদের ক্লাশে একজন নূতন ছেলে ভর্তি হ'ল।

খানিক বাদেই দপ্তরী এসে নাড়ুকে আমাদের ক্লাশে পৌঁছে দিয়ে গেল। আমাকে দেখতে পেয়ে সে পাশে এসে বসল। দিব্যি শাস্ত শিষ্ট মানুষটি। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার যো নেই, পেটে পেটে এর কি বুদ্ধি খেলছে।

নাড়ু রীতিমত ক্লাশে আস্ত, আর আমার পাশটি ছিল তার বসবার যায়গা। ক্লাশের কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই মুখচোরা ছেলেটাই একদিন সকলের সর্দার হয়ে দাঁড়াবে।

ক্লাশের মধ্যে আমার প্রতাপটাই ছিল সকলের চাইতে বেশী। সোজা কথায় আমিই এতদিন সকলকার মাথার ওপর ডাঙা ঘুরিয়ে এসেছি। কি করে আমার হাতের ডাঙা ধীরে ধীরে নাড়ুর হাতে গিয়ে উঠল সেই কথাই এখন বলতে চেষ্টা করবো।

আমাদের যে দলটার কথা বল্লুম, তাকে ছোটখাটো অনেক কিছুই করতে হতো। পাড়ায় ভালো ভালো ফলের বাগান থেকে রাতারাতি ফল চুরী—ও পাড়ার মিস্তির দলের সঙ্গে

ঝগড়া—তাদের জল করবার উপায় ঠাওরানো—ছুই মাষ্টারকে শায়েস্তা করা—এই সব ছিল আমাদের কাজের অঙ্গ।

নাড়ু যখন আমাদের ক্লাশে ভর্তি হলো, ঠিক সেই সময়টাতে এক পণ্ডিত আমাদের বড় জ্বালাতন করছিল। কি করে তাকে জল করা যায়—অনেক দিন থেকেই তার জল্পনা কল্পনা চলছিল। দলের একটা নিয়ম ছিল—কোন সমস্যা উঠলে লটারী করে একজন বিশিষ্ট সভ্যকে কাজের ভার দেওয়া হবে। কি উপায়ে কাজটা সম্পন্ন হবে, সেইটে নিয়েই আমাদের সমিতি মাথা ঘামাচ্ছিল, কাজেই লটারীর কথা আর ওঠেনি মোটেই। আমরা মাষ্টার ঠেকানো বিজ্ঞা তখনো সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারিনি। কারণ আমাদের বয়স ছিল কাঁচা। তারপর তেমন শক্তিও ছিল না, আর বাড়ীতে প্রহারের ভয় যে না ছিল তা বলতে পারিনে।

এর মাস দুই পর—এক দিনের কথা বেশ মনে আছে। পণ্ডিতের ঘণ্টা ছিল সকলের শেষে। কি একটা সামান্য কথা নিয়ে পণ্ডিত মশাই ক্লাশে একটা ছেলেকে বেদম প্রহার করলেন। ইস্কুল ছুটি হবার পর আমরা সকলে মিলে একটা পোড়ো বাড়ীর পেছনে বুড়ো একটা বটগাছের তলায় গিয়ে জড় হলাম। ঠিক হ'ল আর নয়—পণ্ডিতের একটু সাজা হওয়া খুবই দরকার।

বেশপোশাক

আমি বল্লাম—“সে তো নিশ্চয়ই। বাজে কথা ছেড়ে
লটারী কর—যার নাম উঠবে সে নিজের উপায় নিজেই ঠাউরে



বাজে কথা ছেড়ে লটারী কর—

নেবে—উপায়ের আশায় বসে থাকলে, সাতজন্মেও পণ্ডিতকে
শায়েস্তা করা যাবে না।”

সকলেই আমার মতে মত দিলে। লটারী হ'ল। তার পড়ল গিয়ে অমরের উপর। বেচারী নেহাৎ ভাল মানুষ। বয়সেও সকলের ছোট, সে ছলছল চোখে আমার দিকে চেয়ে বললে—“আমি পারবো না নীলুদা।” ছেলেরা বললে—“পারতেই হবে তোকে। লটারীতে নাম উঠেছে যখন, একাজ তখন তোকেই করতে হবে।”

বেচারী মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বললে, “পণ্ডিতমশায় আমায় পড়ান যে”—সত্যি, তার পক্ষে বিশ্ব ছিল যথেষ্টই। অমরকে সকাল সন্ধ্যা ছবেলাই পণ্ডিতের কাছে পড়তে হ'তো। পণ্ডিত মশাইকে শায়েস্তা করতে গিয়ে যদিই বা তার কোপানল থেকে রেহাই পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তার বাবার তরফ থেকেও আশঙ্কা নেহাৎ কম নয়। অমরের বাবা বেশ রাসভারী লোক। ছেলের এ বখামো তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না। কিন্তু হ'লে কি হবে, বয়স তখন আমাদের কাঁচা—রক্তগরম, কাজেই তার এ কাপুরুষতার প্রশ্রয় ত কিছুতেই আমরা দিতে পারিনে। তার ওপর আমি হলুম দলের মোড়ল। আমার কথারও তো একটা মূল্য আছে। তাই বল্লুম—“তা হ'লে তো চলবে না অমর, সমিতির স্বার্থের জন্ত এ তোমার করতেই হবে।”

বেচারীর চোখ দিয়ে টপ করে ছফোটা জল পড়ল, সে

বেশবেরা

আমার হাতটা চেপে ধরে বলে, “নীলুদা—” তার মুখে আর কথা ফুটলো না।—কিন্তু তার হয়ে কথার জবাব দিলে নাড়ু, নাড়ু যে ছুটির পরে আমাদের সঙ্গে এসেছে তা আমি লক্ষ্য করিনি, এতক্ষণ সে বোধ হয় পেছনে ছিল, এইবার এগিয়ে এসে বলে, “নীলে, ওর হয়ে আমি যদি এ কাজের ভার নি, তা হ’লে কারো আপত্তি আছে?”

এইবার সকলের চোখ গিয়ে পড়ল নাড়ুর উপর। নাড়ু কিন্তু দমলে না—আমার চোখের উপর চোখ রেখে দুটো সোজাকথায় বলে, “কি বল?” বেশ মনে আছে সে দিন নাড়ুকে এইরকম আপনা থেকে এসে অস্ত্রের ভার নিজের মাথায় তুলে নিতে দেখে কী লজ্জা পেয়েছিলুম!

গৌরবের রাজটীকা তো আমার কপালে উঠতে পারতো। দলের মোড়ল আমি, যদি সেধে এভার আমি নিজের ঘাড়ে তুলে নিতুম, তা’হ’লে দলে আমার মাথা আরো উচু বই নীচু হ’ত না। কিন্তু এখন তো আর সময় নেই। গৌরব যার জন্ত ছিল সে তো কুড়িয়ে নেয়নি—রাজটীকা আপনিই তার কপালে গিয়ে বসেছে।

আমায় চুপ করে থাকতে দেখে নাড়ু আবার শুধোলে— “তা হ’লে আপত্তি নেইতো?” আমি বল্লুম—“না আপত্তি আর কি, তুমি যদি সেধে ওর ভার নাও তো ভালই।” নাড়ু

বলে—হ্যাঁ, আমিই ওর হ'য়ে পণ্ডিতকে শায়েস্তা করবার ভার নিলুম।”

মনে একরকম বোঝা চাপিয়ে বাড়ী ফিরে এলুম। যে ঘটনার উল্লেখ করলুম সেটা হয় তো খুবই সমান্ধ। কিন্তু, আমার শুধু ঘুরে ফিরে এই কথাটাই মনে হতে লাগল—সেই বা কেন যেচে অমরের ভার নিজের হাতে তুলে নিলে, আমিই বা নিলুম না কেন? এতদিন দলের নেতা হয়ে যথেষ্ট গর্ব অনুভব করেছি। ক্ষমতাও যে নেহাৎ কম দেখিয়েছি তা নয়। দলের সকলেই আমাকে মেনে চলত, এইটাই যে ছিল আমার সকলকার সেরা গর্ব।

আজ যেন কে থেকে থেকে আমার কাণে কাণে বলতে লাগল, রাশ ধরবার খাঁটীলোক মিলেছে নীলু, তোমার কাজ ফুরোলো, তাই মনে হলো—এতদিন ধরে শুধু সর্দারীই করে এলুম, কিন্তু কৈ কারো দুঃখের বোঝা বইবার তো কোন চেষ্টা করিনি! আজ তাই মনে হতে লাগল—হুকুম করতে হ'লে হুকুম মানতেও হয়। এতদিন যে ডাঙা সকলের মাথার উপর ঘুরিয়েছি, সেই ডাঙা গুলো যেন ঠিক হিসেব মতো নিজের মাথায় পড়তে লাগল।

সেদিন রাত্তিরে ভাল ঘুম হ'ল না। আবার এও ভাবলুম—নাড়ু ভার নিলে বটে, কিন্তু কি ভাবে যে কাজ শেষ করবে,

বেশবোঝা

তা কিছু বলে না। ও নূতন ছেলে সোজাসুজি পণ্ডিতকে মার লাগাতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে, তবে সমস্ত ঝোঁকটা আমাকেই সামলাতে হবে। কারণ নাড়ু ধরা পড়লে এটা জানতে আর বেগ পেতে হবে না যে, যাদের কথায় নাড়ু এমনতর কাজ করতে গিয়েছিল, সে দলের সর্দার আমি ছাড়া আর কেউ নয়।

খুব সকালে উঠে নাড়ুদের বাড়ীতে গেলুম। গিয়ে দেখি তার চার বছরের বোনের সঙ্গে ছোট্টটা হয়ে সে পুতুল খেলছে—এ যেন এক নূতন মানুষ। কে বলবে কাল এই নাড়ুই অশ্বে বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল!

দলের সর্দার হিসাবে নিজের উপর শ্রদ্ধা আমার বরাবরই ছিল, আর নিজের গুরুত্বও যখন তখন ছেলে মহলে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র কসুর করিনি। কিন্তু এ ছেলেটা কি? এর ভেতর এমন কি শক্তি আছে, যার বলে এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েও দিব্যি পুতুল খেলায় ব্যস্ত! এক কোণে ডেকে নিয়ে বেশ গম্ভীরভাবে বল্লুম, “যে কাজটা হাতে নিয়েছে সেটা ঠিক করতে পারবে তো?”

সে ঘাড় নেড়ে হাসতে হাসতে বলে, “সেইজন্ম তোমার ভাবতে হবে না? আমি ঠিক করে দেবো। আমি বলুম—“হ্যাঁ, বুঝে শুনে কাজ করবে, আবার পণ্ডিতকে ঠকাতে যেও না যেন।” নাড়ু হা-হা করে হেসে শুধু বলে—“পাগল।” বাড়ী ফিরে এলুম। কিন্তু সারা রবিবারটা বেশ একটা দুর্ভাবনার বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়ালুম।

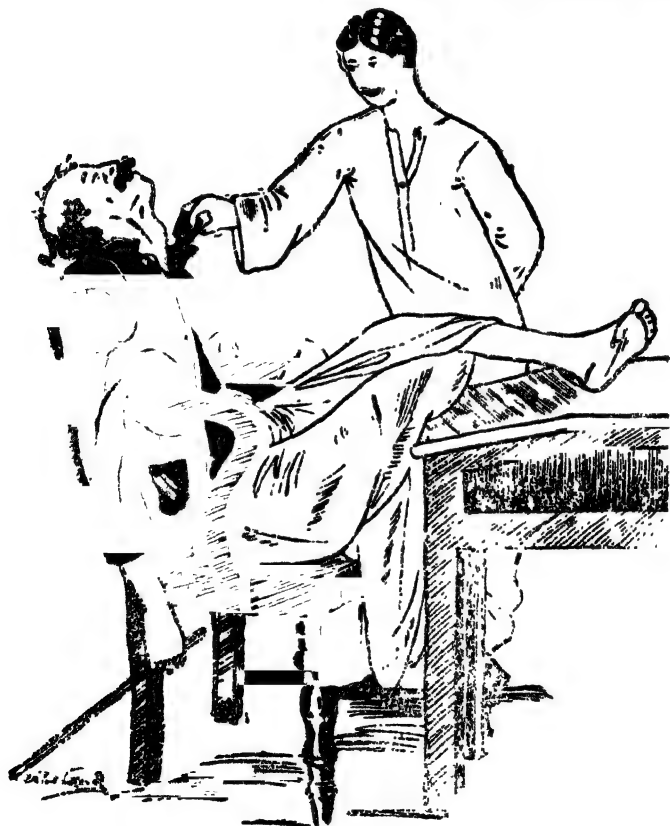
সোমবার দিন সকাল সকাল ক্লাশে গিয়ে হাজির হলুম। আমার মতো অনেকেই আজ আগে থাকতে ক্লাশে এয়েছে। কারণ নাড়ু নূতন ছেলে, তার পর, এখনও অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয়ই নাই। সকলেই আমায় জিজ্ঞেস করতে লাগল—“নাড়ু কি করবে?”

আমি বলুম—“তোমরাও যেমন জান আমি তার চাইতে কিছুই বেশী জানিনে। ক্লাশে এলে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।” ঘণ্টা বাজবার কিছু আগে রোজকার মতো নাড়ু নিজের যায়গাটাতে বসলে। সকলে গিয়ে তাকে ঘিরে ধরে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করতে লাগল। নাড়ু তাদের সকলকে ঠাণ্ডা করে বলে, “তোমাদের কারো ভয় নেই, মারামারির ভেতর যাবো না। খুব সহজ উপায়েই আমি পণ্ডিতকে জব্দ করবো।”

ঘণ্টা পড়ল। রোজকার মত ক্লাশ চলতে লাগলো।

বেশরোয়া

সেদিন পণ্ডিতের ঘণ্টা ছিল ঠিক টিফিনের পর। পণ্ডিত
মশায়ের একটা বড় বদ দোষ ছিল, তিনি পড়াতে পড়াতে



সবগুলো পিপড়ে ছেড়ে দিলে—পৃ: ২১

চুলতে শুরু করে দিতেন। সেদিনও খানিকটা পড়ার পরই পণ্ডিতের হাতের বই টেবিলের উপর থেকে দপ্ করে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর তন্ত্রার ঘোরে পণ্ডিতের মাথাটা পেছনে ঝুলে পড়ল—না তারপর দেখি নাকটাও বেশ একটু ডাকছে।

ছেলেরা সুযোগ বুঝে বেশ গোলমাল শুরু করে দিলে। একটা ছেলে আবার পণ্ডিতের টিকির সঙ্গে সুতো বাঁধতে যাচ্ছিল—এমন সময় নাড়ু চাপা গলায় বললে, “সব চুপ।”

নাড়ুর কথায় যে যার যায়গায় গিয়ে শান্ত শিষ্ট হয়ে বসলে। নাড়ু আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটা শিশি বের করলে। সকলে দেখলে শিশিটা বড় বড় লাল পিঁপুড়েয় ভর্তি—সব্বাই শুধোলে “এ কি হবে?”

নাড়ু বললে দেখ না মজাটা। এইবলে উঠে গিয়ে পণ্ডিতের কোটের গলাটা একটু ফাঁক করে শিশির ছিপিখুলে সবগুলো পিঁপুড়ে ছেড়ে দিলে। ক্লাশময় একটা চাপা হাসির ঢেউ চলে গেল।

নাড়ু বললে—চুপ-চুপ যে যার পড়া করো।” সকলে তখন খুব মনযোগী হয়ে যে যার পড়ায় মন দিলে।

খানিক বাদে পণ্ডিত হঠাৎ তিড়িক্ করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো। তারপর বই খানা কুড়িয়ে নিয়ে চোখ রগড়ে বললে, হ্যা-হ্যা পড়া দাও। আমরা আডচোখে দেখতে

বেশরোয়া

লাগলুম পণ্ডিত হ'এক জনকে পড়া জিজ্ঞেস কচ্ছে আর থেকে থেকে গা নাড়া দিয়ে আবার চেয়ারে বসছে ।



লাফাতে লাফাতে.....বেরিয়ে গেল

তারপর খানিক বাদে আর যাবে কোথা, লাফিয়ে উঠে কোট ছুড়ে ফেলে দিয়ে পণ্ডিত লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ।

ক্লাশে হেঁ হেঁ চীৎকার শুরু হয়ে গেল।

আমি চৈঁচিয়ে বল্লুম—সব চুপ করো পণ্ডিত হয়তো। একুণি হেড্‌ মাষ্টারকে ডেকে নিয়ে আসবে।

সনৎ বল্লে, হ্যাঁ। পণ্ডিত যাবে হেড্‌মাষ্টারকে ডাকতে, তুমি পাগল হয়েছ ?

কথাটা ঠিক। পণ্ডিত মশাই আমাদের উপর যতটা অত্যাচারই করুন না কেন, হেড্‌মাষ্টারকে তিনি বাঘের মতো ভয় করেন, তা ক্লাশ শুদ্ধ সলকারই জানা ছিল।

আমাদের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন হ্যাট কোর্ট পরা ইংরিজী-নবীশ লোক। মুখে সব সময়ই তাঁর ইংরেজী বুলির খৈ ফুটতো। পণ্ডিত মশায়ের ইংরিজী না জানাই ছিল, তাঁর ভয়ের একমাত্র কারণ। তবু সাবধানের মার নাই। একটি ছেলেকে পাঠিয়ে দিলুম পণ্ডিত মশাই কোথায় আছেন দেখতে। সে ফিরে এসে হাসতে হাসতে বল্লে, পণ্ডিত মশাই বাড়ীর দিকে চোঁচা দৌড় মেরেছেন।

যাতে আমাদের ওপর সন্দেহ না হয় সেজন্য চেপ্টার ক্রীড়া ছিল না।

ইস্কুল ছুটি হতে পণ্ডিতের জামাটা নিয়ে আমরা জনা কয়েক তাঁর বাড়ীতে হাজির হনুম। গিয়ে দেখি পণ্ডিত জ্বরে ধুঁকছে, ঔষধের গুণ দেখে আমরা এ ওর মুখ চেয়ে একটু

বেশপেত্রোয়া

চাপা হাসি হেসে নিলুম। তারপর কোটটা ফিরিয়ে দিয়ে, হঠাৎ এমনভাবে চলে আসার কারণ শুধোতে—পণ্ডিত শুধু জবাব দিলে; শরীরটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল তাই চলে এলুম রে। এর বেশী আর কিছু তার মুখ থেকে আমরা বের করতে পারলুম না।

আমাদের জানবারও তেমন আশ্রয় ছিল না। মনে পড়ে সেদিন বাড়ী ফেরবার পথে খুব একচোট হেসে-ছিলুম।

এই ঘটনার পর থেকে সকলেই, বিশেষ করে যাদের উপর পণ্ডিতমশাই অত্যাচার করেছেন তারা, নাড়ুকে খুব মেনে চলত। এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, যারা কাউকে শাসনের গঞ্জীর ভেতর রাখতে চান না—তবু দশজনে তাকে মেনে চলে। নাড়ুর সম্মানও অনেকটা তেমনি পাওয়া। সে কারো ওপর জোর খাটাবার চেষ্টা না করলেও ক্লাশের সকলেই তার আধিপত্য চাইত, আর সমিতির কাজ ছাড়া নিজেদের সামান্য সামান্য কাজেও মত নিতো। এমনি করে দলের প্রত্যেকের মনে মনে যে পাকাপোক্ত আসন নাড়ু পে'ল, তা থেকে সরাবার ক্ষমতা আমার কেন, কারুরই রইল না।

এরপর কদিন আমাদের বেশ আরামে কেটেছিল। পণ্ডিতের তাড়া নেই—বল্লাছাড়া ঘোড়ার মতো চলছিলাম

আমরা বেশ। কিন্তু জ্বর তো কারো চিরদিন থাকে না—
পণ্ডিতেরো থাকলো না।

সেদিন ক্লাশে যেতেই অমর এসে খবর দিলে পণ্ডিত
ভালো হয়ে গেছে, আজ ক্লাশে আসবে। রোদ-চন্ডনে
পুকুরের বুকে হঠাৎ কাল বৈশেখী মেঘের ছায়া পড়লে
যেমনতর দেখায়, এই সু-খবরটা শুনে আমাদের ক্লাশের
দশাও ঠিক তেমনি হ'ল।

একটা ছেলের মনে বোধ হয় আশা ছিল—পণ্ডিতের জ্বর
ছাড়েনি। আস্তে আস্তে অমরকে শুধোলো—আচ্ছা সত্যিই
কি আসবে? তুমি কি করে জানলে ভাই?

অমর বললে—বাঃ আমায় পণ্ডিত আজ সকালে পড়াতে
এসেছিল যে।

সে বললে—সত্যি নাকি?

অমর বললে—হ্যাঁ, আর আমায় কত দোষ দিলে, সেদিন
মুখে বলেনি বটে, কিন্তু তার এটা মনে বিশ্বাস হয়ে গেছে যে,
একাজ আমাদেরই।

আমি বল্লুম—পণ্ডিতকে ছাড়িয়ে দেনা, ও ছাড়া কি
ছুনিয়ায় আর মাষ্টার নেই?

অমর বললে—আচ্ছা ভাই এত ভালো লোকে মরে ওর কি
মরণ নেই।



বেশপেরোয়া

এইবার নাড়ু হেসে বললে—“আরে পণ্ডিত মরুলে কি হবে
তোর যে বাবা বেঁচে—আবার ঐ রকম এক পণ্ডিত এনে
হাজির করবে। যতদিন বাবা আছে—নিস্তার নেই বাবাজী।”
ক্লাশ শুদ্ধ সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

আমরা মনে করেছিলুম জ্বরে ভুগে ভুগে পণ্ডিত মশাই
বেশ একটু শায়েস্তা হয়েছেন। কিন্তু দেখি সে দিক দিয়েই
নয়। বরং তার আক্রোশটা যেন আরো বেড়ে গেছে বলে
বোধ হ’ল। তবে তার সন্দেহটা নাড়ুর ওপর না পড়ে কতক
শুলো পুরানো দাগী নাম-করা ছেলের উপরেই ছিল।

এর মাসখানেক পরেই আমাদের দলের হরিশ বলে একটা
ছেলে পণ্ডিতের পড়ার ঠিক জবাব দিতে পারেনি বলে বেশ
উত্তম মধ্যম এক চোট খেলে। সেদিন বোধ হয় পণ্ডিতের
রাগটা একটু বেশী উগ্র হয়েছিল তাই শুধু প্রহারেই সেটা
শাস্ত হ’ল না। নাড়ুকে ডেকে বললে—“নাড়ু, এক টুকরো
কাগজে ইংরেজীতে লিখে দাও তো ও কোনো পড়া করে না,
আমি হেডমাষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।” আগেই বলেছি
—পণ্ডিত মশাইয়ের ইংরেজী জানা ছিল না—তাই—কোনো
লেখাপড়ার দরকার হ’লেই—তিনি নাড়ুর উপর সে ভারটা
দিতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল—নাড়ুই এ সব কাজের উপযুক্ত
ছেলে।

আমরা দেখলুম আজ ব্যাপারটা তো অনেক দূর গড়াচ্ছে । সকলে মিলে বল্লুম—স্ভার, আজকের মত ওকে মাপ করুন—কাল থেকে ঠিক পড়া করে আসবে ।

পণ্ডিত তার টেকো মাথাটা তুলিয়ে বল্লেন—“না না সে কিছুতেই হবে না—আমি ওকে নীচু ক্লাশে নামিয়ে দেবো ।”

নাড়ু কিন্তু পণ্ডিতের কথায় খুব সায় দিয়ে বল্লেন,—হ্যাঁ পণ্ডিত মশায়, আপনি ঠিক বলেছেন, নীচু ক্লাশে নামিয়ে দিলে ওরই উপকার হবে । আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি ।” এই বলে খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখে পণ্ডিতের হাতে দিলে ।

আমাদের একটা পশ্চিমে পাখাওয়ালা ছিল, সে পাখাও টানতো আর মাষ্টারদের ফরমাস্ও খাটতো । পণ্ডিত মশাই তাকে দিয়ে কাগজখানা হেডমাষ্টারের কাছে পাঠিয়ে দিলে ।

ক্লাশ শুদ্ধ আমরা সকলে নাড়ুর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে রইলুম । হরিশ তো কাঁদ কাঁদ হয়ে পণ্ডিত মশায়ের কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলে ; কিন্তু তিনি পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে রইলেন—তাঁর মত ওল্টাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ।

এমন সময় এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল । হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে পাখাওয়ালা এসে ক্লাশে ঢুকলো । শুধু

বেশকোষ

পণ্ডিত মশাই নয় আমরা সকলে দেখে তো অবাক ! প্রথমটা পণ্ডিতের মুখ দিয়ে কথাই বেরুলো না । তারপর ঝাঁকটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি রে—কি হ’ল ?

পাঞ্জাওয়ালা কঁোপাতে কঁোপাতে বললে—“চিঠি দেখ্কে সাহেব কো বড়ি গোসা হো গিয়া, হামরা তো বাবু আচ্ছা মার লাগায়া—হাম এয়সা কাম কভি নেই কিয়া ।”

পণ্ডিতের তখন হ’য়ে এসেছে । একেই তো হেডমাষ্টারকে পণ্ডিত ভয় করে চলতো—তার উপর এইকাণ্ড, তাই ভয় হ’ল ঝোকের মাথায় কি ফঁাসাদই না বাধিয়ে বসলেন । আন্তে আন্তে বললেন “কেনরে সাহেব রাগলে কেন ?”

পাঞ্জাওয়ালা বললে—হাম কেইসে বলেঙ্গে বাবু ? হামারা তো কুস্ কসুর নেই ছয়া—

এমন সময় নাড়ু লাফিয়ে উঠে বললে,—পণ্ডিতমশাই, হেডমাষ্টারের রাগ-তো হ’তেই পারে—নাঃ আপনি তো হরিশের নামে রিপোর্ট করে ভাল করেন নি ।

পণ্ডিত ভয়ে ভয়ে বললে—কেন কেন ?

নাড়ু বললে, আমি শুনেছি পণ্ডিতমশাই, কথাটা নাকি হেডমাষ্টারের কাণে গেছে যে আপনি ক্লাশ ঠিক রাখতে পারেন না । তার ওপর আজ আবার হরিশের নামে রিপোর্ট করেছেন । হেডমাষ্টারের মনে এটা খুব ভাল রকম ধারণা

হয়ে গেছে, আপনি ক্লাশ চালাতেও পারেন না, আর ছেলেদেরও ঠিকমত শেখাতে পারেন না, এজন্য বোধ হয় এতটা রেগে গেছেন, তিনি যে—বেচারী পাখাওয়ালাকে সামনে পেয়ে তার উপরই সমস্ত ঝাল ঝেড়েছেন, আর তা' ছাড়া ছেলেদের নামে রিপোর্ট করাটা তিনি আদপেই পছন্দ করেন না—। তাঁর ধারণা কি জানেন? যে মাষ্টার নিজেকে শেখাতে পারেন না—ছেলেদের নামে নালিশ করেন তিনিই—

নাড়ুর কথা শুনে পণ্ডিতের মুখ তো চুণ—! বল্লেন, তুমি আমায় কথাটা আগে জানালে না কেন? নাড়ু বল্লেন—তা কি আমার অতটা খেয়াল ছিল? আপনি লিখতে বল্লেন, আমি লিখে দিলুম। পণ্ডিতের মুখে আর রা নেই!

আমরা তো অবাক! কি করে কি ঘটল কিছুই বুঝতে পারলুম না। পণ্ডিতের ঘণ্টার শেষে নাড়ুকে সকলে ঘিরে ধরলুম।

নাড়ু সবাইকে ঠাণ্ডা করে বল্লেন, আরে—সত্যি কি আর রিপোর্ট করলে হেডমাষ্টার রেগে যাব? তা মোটেই নয়। আজ বেশ একটু মজা করেছি। আমরা ব্যস্ত হয়ে বল্লুম, আঃ কি করেছ তাই বল না ছাই? নাড়ু হাসতে হাসতে বল্লেন—কি লিখে দিয়েছিলুম জানিস? লিখেছিলুম The

বেপারোয়া

Pankhawalla Cannot Pull the Pankha well.

(পাখাওয়ালা ভাল রকম পাখা টানিতে পারে না) ।

হেডমাষ্টার তো তাই পড়ে পাখাওয়ালাকে উত্তম মধ্যম বেশ ছুঁয়া দিয়ে দিয়েছে । পণ্ডিত কিন্তু খুব ঘাবড়ে গেছে ।

দেখিস্ আমি বলে দিচ্ছি, বাছাধন আর কখনো কারো নামে রিপোর্ট করবে না ।

সব শুনে ক্লাশশুদ্ধ সকলে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো ।

আমি বল্লুম, কিন্তু বেচারী পাখাওয়ালার কি দোষ, ওকে শুধু শুধু মার খাওয়ালি কেন ?

নাড়ু হাসতে হাসতে বল্লে, আরে বুঝতে পাচ্ছিস্ নে ? একটিলে হু পাখী মারলুম ।

আমি বল্লুম, সে আবার কি ? নাড়ু বল্লে, আর কি ? ঐ যে বেটা পাখাওয়ালাকে দেখ্‌ছো—ভাবছ খুব ভাল মানুষটী—কিন্তু মোটেই তা নয় । তোমাদের পিঠের ওপর যে তেলতেলে বেতগুলো ভাস্লে, তাতে সব ওরি হাতের তৈরী । বেটা রোজ তেল দিয়ে মেজে কুচকুচে করে রাখে । আমি জানতুমও না এ কথা । সেদিন ছুটির পর লাইব্রেরীতে একটু কাজ ছিল, ফেরবার মুখে দেখি বসে বসে বেত মাজ্ছে । বল্লুম ওগুলো ফেলে দে । তা বেটা জবাব দিলে কি শুনবি ? বলে,—আরে ঘাবরাতা কাহে ? ইয়া তো বড়ি আচ্ছা চিজ্ হ্যায় ।

বেশরোয়া

রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগল। সেইদিন থেকে আমি ভাবতে লাগলুম এমন একটা উপায় ঠাওরাতে হবে



ভয় নেই, আজকের মতো দোষ মাপ করলুম—পৃ: ৩২

যাতে নাকি পণ্ডিতও জব্ব হয় আর ও বেটাকেও বেশ একটু

বেশরোহা

শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এতদিন পরে আজকে তার সুযোগ পেলাম। নাড়ুর ছষ্টু চোখ ছটো পিটপিট করে জ্বলতে লাগলো।

তার পর থেকে পণ্ডিত মশাই খুব ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। মারধর করবার শক্তি যেন পণ্ডিত মশায়ের একেবারে শিশির খোলা কর্পূরের মতো উড়ে গেল।

সাপুড়েরা যেমন গাছের শেকড় দেখিয়ে বিষওয়াল। সাপকে কাবু করে রাখে, নাড়ুর তৈরী সেই ফুস্মস্তরের জোরে পণ্ডিত একেবারে ভাল মানুষটা হয়ে রইল।

এই ঘটনার তিন চার দিন পর সামান্য একটু সর্দি জ্বর হওয়ায় একদিন ইস্কুলে যাইনি, বিকেলের দিকটায় দাদার আলমারী থেকে লুকিয়ে এনে একখানা বাঙলা উপন্যাস পড়ছিলাম—রাস্তার দিকে পায়ের আওয়াজ শুনে বইখানা লুকোতে যাবো—এমন সময় চেনা গলায় শুন্তে পেলাম—ভয় নেই, আজকের মত দোষ মাপ করলুম। হেসে আর একখানা চেয়ার তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লুম—একি, নাড়ু কি মনে করে ?

নাড়ু চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে বল্লে— ইস্কুলে যাওনি, ভাবলুম—শরীর খারাপ হয়েছে বোধ হয়—কিরতি পথে একবার দেখে যাই

এতটা আশা করিনি।

তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলুম। ক্রাশের কেউতো এলো না—শুধু সে-ই আসে কেন? তা ছাড়া ওর বাসা এখন থেকে তো কঁয় দূর নয়! নিজের যতটা সে আমাদের দিয়ে ফেলেছে—আমরা তো কৈ সাহস করে ততটা দিতে পারিনি। কোথায় যেন সঙ্কোচের একটা কাঁটা বিঁধে থাকে—খোলাখুলি ধরে দিতে দেয় না।

নাড়ু বললে, মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে তো আমার পেট ভরবে না। ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে—একবার বাড়ীর ভেতর থেকে ঘুরে এসো।

চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে—একবুক আনন্দের বোঝা নিয়ে ছুটলুম মার কাছে খাবার আনতে।

সব শুনে মা বললেন—আঃ কি যে তোদের কাজের ছিরি বুঝতে পারিনে। ওকে বাইরে বসিয়ে রেখে এসেছিচ্ছ কেন? ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়—আমার সামনে বসে খাবেখ'ন।

দুজনে পাশাপাশি জলখাবার খেতে বসলুম। খেতে খেতে নাড়ু বললে, পণ্ডিত আবার দুষ্টুমী শুরু করেছে রে। আমি উৎসুক হয়ে বল্লুম সে কি? আবার কোন পথে? নাড়ু হেসে বললে, ভয় নেই এবার অহিংস উপায়ে। আমি বল্লুম—সে আবার কি?

শেষের কথা

নাড়ু বন্ধে, এবার মারধর ও নয়—রিপোর্ট ও নয়, এবার শুধু কথায় মার প্যাঁচ। সত্যি ভাই আজকাল এমন সব টিপ্সনী দিয়ে কথা বলছে যে, পিঙ্কি শুদ্ধ জ্বলে ওঠে। আমি চোখ বুজে বলুম—“মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী!”

নাড়ু চোঁচিয়ে উঠল—না,—কথা দিয়েই কথার মুখ বন্ধ করতে হবে।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নাড়ুর সঙ্গে অনেক রকম কথাবার্তা চলল।

যাবার সময় আমার পিঠ চাপড়ে বলে গেল—সর্দি যদি ছেড়ে দাও, মেলা কাজ রয়েছে আমাদের—তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে—হ্যাঁ, কাল আসছে তো?

সে চলে গেল।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। এই নাড়ুই পণ্ডিতের গায়ে পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছিল, আবার আজ আমি ইস্কুলে যাইনি বলে সেই নাড়ুই ছুটে এসেছে আমায় দেখতে। আমার একটা ধারণা ছিল—একটু বোম্বেস্টে—বেপরোয়া গোছের ছেলে যারা, কারো সুখ দুঃখের ধার তারা ধারে না। নিজের আনন্দে নিজেই তার পথ তৈরী করে চলে যায়। কিন্তু নাড়ু তো ঠিক তা নয়, এ শুধু রাস্তা তৈরী করেই ক্ষান্ত নয়—আশে পাশে চাইবার অবকাশও এর মধ্যে আছে।

তার পরের দিনও শরীর তেমন ভাল ছিল না। কিন্তু নাড়ুর সে ডাক উপেক্ষা করে ঘরে বসে থাকতে মন চাইল না—ক্লাশে গেলুম। গিয়ে দেখি পণ্ডিতের ওপর আবার সকলেই খাপ্পা হয়ে উঠেছে। কিন্তু ঘণ্টা বাঁধবে কে? ইচ্ছে আছে পুরোদমে সকলেরই, কিন্তু সাহস কৈ?

খানিক বাদে নাড়ু এসে হাজির। আমার দেখে বল্লে, সেরে গেছিস্? বেশ! বেশ!

আমি বল্লুম, ক্লাশশুদ্ধ সকলেই তো পণ্ডিতের মুণ্ডপাত কচ্ছে।

সে শুধু জবাব দিলে “হু”।

সেদিন ইংরেজী ঘণ্টার পর পণ্ডিতের ক্লাশ। ইংরেজীর মাষ্টার চলে যেতে সকলে ভয়ে ভয়ে যে যার যায়গায় বসল।

পণ্ডিত ক্লাশে ঢুকে আধ ঘণ্টাটাক সকলের ওপর টিপ্পনী কাটতে লাগল—

আঃ চুলের বাহার ত খুব দেখছি? পড়াশুনার বেলায় চু চু! আবার কাউকে হয়তো বল্লে—ওরে জ্ঞানা...এঃ নামতো খুব জমকালো—জ্ঞানাজ্ঞান—কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন! ছাখু তোর বাবাকে বলিস্—তোকে দিয়ে লেখা পড়া হবে না—আরে বাবা ছাগল দিয়ে হালচাষ যদি হ’ত, ত কেউ বলদ রাখত না। আর একজনকে ডেকে

শেষোক্ত

হয়তো বলে—জগাকে সেদিন ঐ পাড়ায় বিয়ে-বাড়ীতে দেখলুম—যেমন নবকান্তিকটা! এখানে তোর কিছু হবে না, বলিস তোর খুড়োকে, পণ্ডিত মশাই একজোড়া ময়ূর কিনে দিতে বলেছে।

এমনি নানারকম কথার খৈ পণ্ডিত মশায়ের মুখ থেকে ফুটতে লাগলো। তারপর আধঘণ্টা পর ডাক এলো—এই ক্যাবলা, বই নিয়ে আয়, পড়া দে। সেদিনকার পড়ার ভেতর এক জায়গায় ছিল—“শূণ্ডুরে বর্বরঃ”।

পণ্ডিত মশাই বই না খুলেই আমাদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলে উঠল—শূণ্ডুরে বর্বরঃ—

হঠাৎ পেছন দিক থেকে তার জবাব এলো—“গর্দভঃ ক্রতে”।

ক্লাশ শুদ্ধ সকলে নিঃশ্বাস বন্ধ করে কাঠ হয়ে গুরুতর এক দণ্ডের আশঙ্কায় বসে রইল। জবাব যে কার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো তা এক পণ্ডিত ছাড়া কারো জানবার বাকি রইল না।

পণ্ডিতের কান লাল হয়ে উঠল। কাউকে কিছু না বলে, বইখানা টেবিলের ওপর রেখে পণ্ডিত ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। খানিক বাদে হেডমাষ্টার মশাই আর তার পেছনে দণ্ডুরী লিক্লিকে একখানা বেত হাতে করে আমাদের ঘরে ঢুকলো।

হেডমাষ্টার প্রথমে আদেশ, শেষে অজরোধ করেও কে এমন কথা বলেছে তাকে খুঁজে বার করতে না পেরে, ক্লাশ শুদ্ধ সকলের ছু'টাকা করে জরিমানা করে চলে গেলেন।

জরিমানা সকলেই দিতে পারব না, তা ছাড়া পণ্ডিতের ক্রোধানল কি নতুন বেশে আবার দেখা দেয়, সে ভয় সকলেরই ছিল।

পরদিন প্রথম ঘণ্টাই পণ্ডিতের। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে এসে আমরা ক্লাশে ঢুকলুম।

কিন্তু খানিক বাদেই আমাদের অবাধ করে পণ্ডিতের বদলে অঙ্কের মাষ্টার এসে হাজির। আমরা এ ওর মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগলুম। কারণ পণ্ডিত এসেছে এ আমরা-ইস্কুলে ঢোকবার সময়ই দেখেছি—অঙ্কের ক্লাশ শেষ হতেই একটা ছেলে ছুটে লাইব্রেরীতে গুল খোঁজ নিতে। মিনিট দশেক পরে সে লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে স্ত-বকর দিলে—পণ্ডিত আর আমাদের ক্লাশে পড়াবে না, সে আমাদের নীচু ক্লাশের সঙ্গে রুটীন বদলে নিয়েছে।

রাম বাঁচা গেল ! আমাদের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। আমরা নাড়ুকে ঘিরে ধেই ধেই করে ক্লাশের মধ্যে নাচতে শুরু করে দিলুম।

পণ্ডিত আমাদের ছেড়ে যাবার পর থেকে ক্লাশটা

বেশপোয়া

ভয়ানক নিষ্কর্ষ হয়ে পড়ল। খাঁকা খেলে লোকের স্বরূপটা যেমন শীগ্গির বেরিয়ে পড়ে, তেমনটি আর কিছুতে নয়। কষ্টি-পাথরের সঙ্গে ঠোকা ঠুকিতেই পাকা সোনার ঠিক রং ধরা পড়ে।

পণ্ডিতের সে তাড়নাও আর নেই, আমাদের মাথা ঘামাবারও প্রয়োজন নেই। দিব্যি গড়লিকা প্রবাহে ভেসে চলেছিলুম, শাস্ত নিরীহ শিশুর মতো। আমাদের সুবোধ বালক হবার আরো একটা কারণ ছিল। একটা বছর তো শুধু পণ্ডিতকে নিয়েই কাটালুম। সামনেই পরীক্ষা। শাস্ত হবার এর চাইতে আর ভাল কারণ নেই!

পরীক্ষার কিছুদিন আগে আমরা দিন সাতেকের ছুটি পেলাম। এতে পড়াশুনার সুবিধা হ'লেও আমাদের দলের ভয়ানক ক্ষতি হতে লাগল। কারণ দেখাশুনা একরকম প্রায় বন্ধ হয়েই গেল। আর এ সময়টাতে বাঙালীর ছেলে আমরা বড় একটা কেউ বাইরের ডাক শুনতে পাইনে। বইয়ের উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকাই এসময়টার চিরকেন্দ্রে প্রথা। পরীক্ষার আগের ক'দিন বাইরে যাইনি। এ ক'দিন পড়াশুনায় বাড়াতেও বেশ ভাল নাম কিনেছিলুম।

পরীক্ষার প্রথম দিন সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে পড়বার ঘরে ঢুকতেই মা ডেকে বললে—নীলু, একবার এ ঘরে আয়।

গিয়ে দেখি শোবার ঘরে একটা ঘটের উপর আমার পল্লব, আর ঘটের গায়ে তেল সিন্দূর দিয়ে একটা মূর্তি আঁকা। মা তার সামনে আমায় দাঁড় করিয়ে বল্লে, নমস্কার কর। আমি তখন পালাতে পারলে বাঁচি। টিপ্ করে এক নমস্কার করে পালাতে যাচ্ছি, আমার হাত ধরে মা বল্লে, দাঁড়া বোস একটু। নিরুপায় হয়ে বসে পড়লুম। মা আমার মাথায় সাপের মন্তুরের মতো বিড়বিড় করে কি সব পড়তে লাগলেন।

ঠিক এমনি সময়টায় দরজার গোড়া থেকে আগুয়াজ এলো—খুব শক্ত মন্তুর পড়ে দিন মাসিমা, পরীক্ষার ভয় মগজে ঢুকতে পারবে না। আমি লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠলুম। মা বিরক্ত হয়ে বল্লেন—তোদের আর তর সয় না, তারপর হাসিমুখে নাড়ুর দিকে তাকিয়ে বল্লেন—আয় নাড়ু নমস্কার কর। নাড়ু বল্লে, ভূত-প্রেতের আবার যাত্রা অযাত্রা কি মাসিমা—যেখানে সেখানে অমনি আমাদের রাস্তা করে দেয়।

মা বল্লেন—তোরা যে আজকাল কি হয়েছিস্—ঠাকুর দেবতা মানিসনে।

নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বল্লে—কে বলেছে মাসিমা, আমরা ঠাকুর দেবতা মানিনে? দেখে আসুন আজকে কালীবাড়ী—পড়ুয়াদের কি ভীড়! আজকে সব ভক্ত!

বেপারোজা

নাড়ুর বসবার ভঙ্গি দেখে মা হাসতে লাগলেন।

পরীক্ষা দিতে যাবার সময় নাড়ু—মার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বসে, এতেই আমার যাত্রা-পথে কোন বাধা থাকবে না মাসিমা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বসে—নে নীলু, মার পায়ের ধুলো নে—বাজে ঢং তোরা খুব জানিস, খাঁটা আশীর্বাদ নিতে হয় তো সে ওইখানে—বলে একরকম জোর করেই আমাকে মার পায়ের তলায় বসিয়ে দিলে।

ছজনে চুপ্-চাপ্ রাস্তা চলছিলুম, প্রথম নাড়ুই কথা বলে। রাস্তার পাশে কালীবাড়ীর দিকে আঙ্গুল উঁচু করে বলে ‘ঐ দেখ্।’ চেয়ে দেখি ছেলের পাল কালীবাড়ীর দেওয়ালের ওপর মাথা ঠুকছে।

নাড়ু বলে যেতে লাগলো—‘হয়তো এরাই এর আগে কালীবাড়ীর দিকে ফিরেও তাকাতো না। আর কাণ্ড দেখেছ—মাথা ঠুকতে ঠুকতে দেওয়ালের গা তেলতেলে করে দিয়েছে। আরে বাবা, একি আফিসের বড়বাবু, যে একদিন খোসামোদ করলে কিম্বা ডালি পাঠালেই কাজ হাঁসিল হ’বে?’

নাড়ু এমনি অনেক কিছুই বকে যেতে লাগলো। তার

কোনো কথার জবাব দিলাম না—শুধু এই কথাটাই ভাবতে লাগলাম—বাস্তবিক আমরা কি হতে যাচ্ছি !

পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। উপরা-উপরি দিন করেকের



ছেলের পাল কালীবাড়ীর দেওয়ালের উপর মাথা ঠুকছে—পৃ: ৪০

পরিশ্রমে শরীরটা একটু ভেঙ্গে পড়েছিল। বিছানার ওপর দেহখানা এলিয়ে দিয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে পরীক্ষার ফলের কথাই ভাবছিলাম—এমন সময় অমর এসে খবর দিলে,

বেশকলার

নাড়ু আমায় ডাকছে। বেরোবার বড় ইচ্ছে ছিল না, তবু ক্লান্ত দেহটাকে টেনে তুলে অমরের সঙ্গে রাস্তায় এসে নামলুম। নাড়ুদের ওখানে পৌঁছে দেখি তার পড়ার ঘরে আমাদের দলের বেশ একটা মজলিস বসে গেছে।

নাড়ু আমায় বললে, ‘কিহে পোষা মেনিটার মতো একেবারে ভেতরে সঁদিয়ে আছ—বেরোবার নামটা নেই!’ বল্লুম—‘শরীরটা তেমন ভাল নেই।’

আমার হুঁহাত ধরে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বললে, আরে ওসব শরীর খারাপ টারাপ সব সেরে যাবে’খন। ছাখ, একটা কথা শিখিয়ে দিচ্ছি, শরীরের পেছনে যতই লাগবে—তোমাকে সে ততই পেয়ে বসবে। মনে স্ফুর্তির ঝড় বইয়ে দাও দেখি—এই বলে সে আমার সমস্ত শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে পাশের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে। আরে বাবা সেকি ঝাঁকুনি—তাতে আমি তো আমি, আমার অন্তরাআয় পর্যন্ত কাঁপন লাগিয়ে “শরীর খারাপ” যে কোথায় পালিয়ে গেল—তার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না!

থগেন বললে, সত্যি ভাই একটানা জীবন আর ভালো লাগে না। এই একজামিন হয়ে গেল, একটা কিছু করো—নাড়ু, একটা চড়ুই ভাতিই না হয় জোগাড় করে ফেল। সকলে সায় দিয়ে বললে—ঠিক, ঠিক—একটা বড়রকমের

চড়ুইভাতির বন্দোবস্ত করে ফেল দাদা। ওপাড়ে নদীর চড়ে গিয়ে বেশ হবে'খন। কথাটায় বেশ রস পেলুম। মুখ চট্কে বল্লুম—ইঁ। একটা পাঁঠা কিম্বা খাসী যদি জোগাড় করতে পার, তবে নেহাৎ মন্দ হ'বে না।

নাড়ু বল্লে, চড়ুইভাতিও হ'তে পারে পাঁঠাও চলতে পারে—কিন্তু পয়সা দিয়ে কিনে নয়। যদি ছলে-বলে-কৌশলে জোগাড় করতে পার, তবেই বল্ব তোমাদের বাহাছরী।

আমি বল্লুম—কথাটা নেহাৎ মন্দ শোনাচ্ছে না—বেশ একটু অ্যাড্ভেঞ্চারও হবে।

বিপিন চেয়ারটা একটু সরিয়ে এনে গলা খাটো করে বল্লে—ওহে আমি একটার খোঁজ দিতে পারি।

হরিশ বল্লে—কোথায় হে? পাড়ার মিস্ত্রিদের সেই কালো পাঁঠাটা বুঝি?

বিপিন বিরক্ত হয়ে বল্লে, না না মিস্ত্রিদের হতে যাবে কেন? ওপাড়ার রায়বাবুদের বেশ একটা নধর পাঁঠা দেখে এলুম। বোধ হয় কোনো প্রজা, দিন দুয়েক হয় দিয়ে গেছে।

নাড়ু বল্লে,—ঠিক। বড় লোকদের জিনিস খাওয়াই ভালো। তার ওপর যখন প্রজার ঘাড় ভেঙ্গে আদায় করেছে ও তো আমাদেরই পাওনা।

অনেক গবেষণার পর ঠিক হ'ল রায়বাবুদের নধর পাঁঠাটি

বেশবোঝা

যখন আমাদের রক্তমাংস বৃদ্ধি করবার জন্তই মরজগতে এসেছে, তখন তাকে কিছুতেই এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হবে না।

এখন কি উপায়ে ছাগ-নন্দনকে ওখান থেকে সরানো— সেইটেই হ'ল সব চাইতে বড় সমস্যা। নাড়ু বললে, আগে হু' একদিন গোয়েন্দাগিরি করতে হ'বে। কোথায় তা'কে সমস্তদিন বেঁধে রাখে—কে তা'র রক্ষক—এই সব খুঁটি নাটি তত্ত্ব আগে জোগাড় করে ফেল—তারপর এক শুভদিন দেখে কাজ করলেই হবে। অমর ছেলেমানুষ, তাকে কেউ সন্দেহ করবে না—কাজেই টিকটিকির কাজটা তার উপরেই পড়ল।

এর দুদিন পরে সন্ধ্যাবেলা—নাড়ুর ওখানে মজলিস্টা বেশ জমে উঠেছে, এমন সময় অমর ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে সকলের মাঝখানে রূপ করে বসে পড়ল।

হরিশ তার হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলে বললে,—কিহে, ফিটের ব্যামো ট্যামো নেই তো ?

অমর শুধু চোখ বুজে বললে,—পাখী উড়ে গেছে।

আমি বল্লুম—কথাটা একটু ব্যাখ্যা করে ব'ল, ভাল বুঝতে পারলুম না।

অমর বললে,—বলব আমার মাথা আর মুণ্ড। রায়বাবুদের পাঁঠা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে। নাড়ু লাফিয়ে উঠে বললে, অ্যা—বলিস্ কিরে ? তার চেয়ে আমার যে জিভে জল

আসে—সেই জিভটা কেটে ফেলে দে না—রে—তারপর ভেউ ভেউ করে কান্না শুরু করে দিল।

আমি হেসে বল্লুম, আহা আগেই মরাকান্না শুরু করে দিলে ? ওতে আমাদের শুভকাজের অকল্যাণ হবে যে—

নাড়ু বল্লে—হয়েছিল কি রে—পাঁঠার কথা কাউকে কিছু বলেছিলি নাকি ?

অমর নাড়ুর হাত ধরে বল্লে, আমি তোমার গা-ছুঁয়ে বলতে পারি—কাউকে আমি পাঁঠার একটা কথাও বলিনি ; তবে—বলে সে একটা ঢোক গিলল।

নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বল্লে—আবার ‘তবে’ কি রে ? অমর মাথা চুলকে বলল—যে ছোকরা চাকরটা পাঁঠাকে সারাদিন আগলে রাখে, আমি শুধু তাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—পাঁঠাটা রাত্তিরে কোথায় থাকে ?

নাড়ু হাঁ করে ^{অমর} আমর কথার গিলছিল—এই কথা শুনে সে হতাশ হয়ে বসে পড়ে বল্লে—এঃ তবেই সেরেছে ! ও নিশ্চয়ই বাড়ীতে গিয়ে এক কথায় দশকথা সাজিয়ে বলে দিয়েছে। তার ফলে হয় পাঁঠা রায়বাবুদের পেটে গেছে, নয়তো অল্প কোন আত্মীয়-বাড়ী রেখে দিয়েছে। অমর এতক্ষণ বোকা বনে গিয়ে চুপ্চাপ বসে ছিল ; এইবার একটু সাহস পেয়ে খাটের ওপর ছ’হাতে ভর দিয়ে শরীরটা একটু

বেশরোজা

সোজা করে—ধীরে ধীরে চোখ ছোটো বড় বড় করে বন্ধে, না আমি জানি রায়বাবুরা খায়নি।

হরিশ বলে, না যদি খেয়ে থাকে—তো আমি জোর করে বলতে পারি ও পঁাঠা দারোগা বাড়ী গেছে। নাড়ু বলে—দারোগা বাড়ী আবার কোন্টা বলতো? আমি বলুম—দারোগা বাড়ী—পাশের গ্রামের বড় জমিদার। ওদের কোন্ পুরুষ নাকি দারোগাগিরি করে মেলা টাকা জমিয়েছিল—সেই থেকে ওরা জমিদারী কিনে কিনে—আজ মস্ত বড় জমিদার।

নাড়ু বলে,—ও সব দারোগা ফারোগা বুঝিনে, যখন একবার লোভ লাগিয়ে দিয়েছে, ও পঁাঠা তখন খেতেই হবে।

বিপিন বলে—শেষ কালে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? না-বাবা অতটা সহ্য হবে না—

নাড়ু টেবিলের ওপর একটা ঘুসি মেরে বলে,—কেন হবে না—আলবৎ হবে। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে পেটে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, এই আমি বলে রাখলুম ও পঁাঠা আমাদের পেটের মধ্যে আসবেই, তোমরা সব নিশ্চিন্ত হয়ে মশলা বাটতে পার। হরিশ বলে, গাছে কাঁঠাল দেখে গৌফে তেল দিলে কি আর সব সময় কাঁঠাল ছিঁড়ে পড়ে দাদা?

নাড়ু বলে—কাঁঠাল শুধু ছিঁড়ে পড়বে না—গৌফের কাঁক

দিয়ে একেবারে মুখের ভেতর গিয়ে সঁধোবে। তবে বাবাজীদের একটু খাটতে হবে, তা আগেই বলে রাখছি। সকলে বললে, তা'তে আমরা খুব রাজী—কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা তোমাকেই বাঁধতে হ'বে। নাড়ু বললে—নিশ্চয়।

হরিশ বললে—পাঁঠাতো আগেই পেটে পুরে রাখলে, কিন্তু দারোগাবাড়ীতে যেতে হ'লে যে এক নৌকো ছাড়া আর উপায় নেই তা জানো? নাড়ু চোক কুঁচকে বললে—কেন? হরিশ বললে—খেয়া নৌকোয় পার হওয়া যায় বটে, কিন্তু পাঁঠা নিয়ে সকলের সামনে তো আর খেয়া দিয়ে আসতে পারবে না।

বিপিন বললে,—নৌকোর জন্তু আটকাবে না—আমাদের ঘাটের নৌকো রয়েছে। আর সুবিধেও আছে—দাদা বাড়ীতে নেই।

নাড়ু বললে,—তবে চল্ এক্ষণি, আর দেরী নয়।

আমি লাফিয়ে উঠে বল্লুম—আজই?—এক্ষণি? তুমি পাগল হয়েছ নাড়ু?

নাড়ু মাথা নেড়ে বললে, কথা যখন উঠেছে, তখন ও পাঁঠার মাংস আজই আমার মুখের মধ্যে চাই। এই বলে সে মুখ চোট্কাতে লাগল। পাঁচ জনে তক্ষণি উঠে পড়লুম। রাস্তায় কোন কথা হ'ল না। এই কথাটুকুই শুধু সকলে প্রাণে প্রাণে বুঝলুম, যে কাজ আমরা শুধু নিছক আমোদের জন্তে

বেশপোকা

হাতে তুলে নিলুম, তা আজ যে করেই হোক শেষ করতে হবে। আর আমাদের একাজ করবার সকল উদ্ভূতের কেন্দ্র হয়ে রইল—নাড়ু।

বিপিনদের বাইরের ঘাটেই নৌকো বাঁধা ছিল, আমরা গিয়ে নৌকোয় উঠলুম।

নাড়ু বলে,—বিপিন, হাত-বৈঠে আছে? “আছে” বলে বিপিন বাড়ীর ভেতর চলে গেল;—খানিক বাদে চারখানা বৈঠে নিয়ে এসে নায়ে উঠল।

আমরা চারজন চার খানা বৈঠে ধরলুম। রাস্তা ভালো জানে বলে হরিশ গিয়ে হাল ধরল। কোন কথা নেই, শুধু ছপ্, ছপ্ শব্দে জল কেটে বৈঠেগুলো নৌকোটাকে এগিয়ে নিয়ে চলল। সব চাঁদ উঠেছে। গাছের মাথায় মাথায় ছিট্কে ছিট্কে জ্যোৎস্না পড়ে আকাশটাকে ফাঁক করে ধরে রেখেছিল। মন্দিরের পাশ দিয়ে, বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে, তেঁতুল গাছের ওপর দিয়ে, জ্যোৎস্না এসে চলতিপথে আমাদের নৌকোর ওপর আবেশ ছায়ায় খেলা শুরু করে দিল। খানিকটা গিয়েই নৌকোটা বাঁ দিকে চলল। সোজা খাল—তুধারে ধানের ক্ষেত। ধান কাটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। মাঠের মাঝে মাঝে বড় বড় খড়ের গাদা—ঠিক যেন নির্ঝাক সাক্ষীর মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

দূরে চাষাদের কুড়ে থেকে ক্ষীণ আলো বেরিয়ে জোৎস্নার
মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। এপাড়ে রায়বাগু-
দারোয়ান তেওয়ারীর পাকা কুঠুরী থেকে ভজন গানের
ছ'একটা রেশ ভেসে আসছিল। আমাদের হাতের বিরাম



চার জনে চার খানা বৈঠে ধরলুম—পৃঃ ৪৮

নেই—ছপ্ ছপ্ শব্দে নৌকো বর্ষার জলে মোচার খোলার
মতো এগিয়ে যাচ্ছিল। আরো খানিকটা গিয়ে নৌকো একটা
সরু খালের ভেতর ঢুকল। ছধারে লম্বা লম্বা গাছ গুলো

মাথার ওপরে জড়িয়ে এক হয়ে গেছে—চাঁদের আলো তার ভিতর রাস্তা খুঁজে পায় না—ঠিক এমনি একটা খাল দিয়ে আমাদের নৌকো চলতে লাগল।

এতক্ষণে আমি একটা কথা বলুম। শুধোলুম—এর চাইতে কি আর ভালো রাস্তা নেই রে হরিশ? জবাব এলো—কিন্তু তা হ'লে অনেকটা ঘুরতে হ'বে।

নাড়ু বললে—তবে এইটেই ভালো।

আবার চুপ্‌চাপ্‌।

সেই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তালে তালে বৈঠে ফেলতে ফেলতে মনে হ'ল আমরাও যেন এই অন্ধকারের এক একটা বিশেষ অংশ। এই নিশ্চল বট-অশ্বখের সার, দিগেই মাঝে মাঝে নিশাচর পাখীর ডাক, ছুধারে এই পচা আম মাবজ্ঞনার গন্ধ—এদের সঙ্গে যেন আমরা কোন্ যুগ থেকে খা একেবারে মিশে আছি। আমাদের বাদ দিয়ে—এই বিভৎস রসের অনুভূতি যেন অসম্পূর্ণ রয়ে যায়।

এ ভাবটা কতক্ষণ ছিল জানি না। চমক্‌ ভাঙল—যখন নৌকোটা থ—সু করে এক যায়গায় এসে ভিড়ল। অন্ধকার

তত বেশী না থাকলেও যায়গাটা যেন আরো ভরাবহু বলে
ঠেকল।

এতক্ষণ যা দেখ্‌ছিলাম—তা অন্ধকারের ভেতর দিয়েই
দেখ্‌ছিলাম। বিশেষ একটা আকৃতি পেয়ে তা আমাদের
চোখের সামনে ভেসে ওঠেনি। কিন্তু এখন আলো আঁধারের
মাঝে যে যায়গায়টায় এসে পৌঁছলুম, সে তার একটা রূপ
আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরল। নৌকোটা যেখানে
এসে লাগল, ঠিক তার সামনেই একটা উঁইয়ের ঢিবি—যেন
আশে পাশের গাছগুলোর সঙ্গে বাজি রেখে তার মাথাটা
আকাশের ভেতর দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে। হৃদিকে পানা-পচা
ভূর্গন্ধে বোধ হয় ভূতপ্রেতেরও অরুচি ধরে। আশেপাশের
গাছের রাশি রাশি ঝরা পাতা পড়ে সমস্ত যায়গাটার মাটি
ঢেকে রেখেছে। সকলেই বৈঠে রেখে উঠে দাঁড়ালুম।

নাড়ু আমায় বল্লে—না, সকলে গেলে তো চলবে না।
তুমি আর অমর নৌকোয় থাক। আমরা তিনজনে পাঁঠার
খোঁজে যাব; আমরা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত নৌকো এখান
থেকে কোথাও সরিও না। তারা তিনজনে নৌকো থেকে
নেমে ঝরা পাতার ওপর দিয়ে খচ্‌ খচ্‌ শব্দ কর্তে
কর্তে ওপরে উঠে গেল। উঁইয়ের ঢিবির আড়াল
হ'তেই ধীরে ধীরে তাদের পায়ের শব্দ মিলিয়ে এলো।

বেশদেওয়ান

শীতের সন্ধ্যা—বেশ একটু ঠাণ্ডা বাতাস চালিয়েছিল—
রূপারটা ভাল করে মাথার ওপর দিয়ে জড়িয়ে বসলুম।

অমর বললে—বড় মশা হে।

বাস্তবিক এতক্ষণ খেয়াল করিনি—এইবার নিজের
আশেপাশে চেয়ে দেখি, ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে যেন
আমাদের ছঁেকে ধরেছে। তার ওপর অনেকদিন হয়তো
মানুষের তাজা রক্তের স্বাদ পায় নি, তাই যেন সব খোঁজ
পেয়ে দল বল নিয়ে ছুটে আসতে লাগল।

বল্লুম—রূপারটা দিয়ে ভাল করে জড়িয়ে বোস।

অমর বললে—নাহে শুধু জড়িয়ে বসলে হবে না—এই
বলে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রূপারে ঢেকে লম্বা হয়ে শুয়ে
পড়ল।

আমি বল্লুম—ওকি শুয়ে পড়লি যে! অমর শুধু বললে ‘হু’।

সেই নির্জন প্রান্তরে আমি একা বসে রইলুম। ছেলে-
মহলে সাহসী বলে আমার বেশ নাম ডাক ছিল। অমাবস্তার
রাত্রে শ্মশানে যাব বলেও ছ’একবার বাজী রেখেছি। কিন্তু
আজ এই ঠাণ্ডা শীতের বাতাসে আলো আঁধারের মাঝখানে
কোথেকে ভয়ের একটা রেখা যেন আমার মনের কোণে উঁকি
মারতে লাগল। আস্তে আস্তে ডাকলুম—অমর—ওরে অমর—

রূপারের তল থেকে ক্ষীণকণ্ঠে আওয়াজ এলো উ—

বুঝলুম তাকে ডাকা বুধা । এইবার যেন চারদিকে নিস্তব্ধতা আমাকে আরো পেয়ে বসল । কেন যেন মনে হ'ল আমি প্রেতপুরীর ঠিক মাঝখানে এসে বসেছি । খানিক বাদেই হয়তো চারদিকের এই ঝোপ ঝাপের কাঁকে কাঁকে তাদের মজলিস বসে যাবে ।

আমি যেন আজ ছোখ মেলে সাম্না সাম্নি তাই দেখতে—কা'র ডাকে এখানে এসে বসেছি । —“তারা আসবে” এই কথাটাই যেন জগতে সব চাইতে সত্য বলে ঠেকতে লাগল ।

হঠাৎ মাথা উঁচু করতেই ওটা কি ? নড়ছে—না আমার দিকে এগিয়ে আসছে ! চোখ রগড়ে আবার দেখলুম—দেখি এক গোছা কাশফুল বাতাসে ছলছে । মনে হ'ল হাতের মুঠোয় প্রাণটা আবার ফিরে পেলুম । এর পর আর কোনও দিকে চাইবারও সাহস রইল না—এবার যদি কাশফুল না হয়ে—

ভাবতেও গায় কাঁটা দিয়ে উঠল ।

তারপর পেছন দিকে—ও আবার কিসের শব্দ ? ছহাত দিয়ে বুক চেপেধরে কাঠের মত বসে রইলুম ।

হঠাৎ শুকনো পাতার উপর খস্ খস্ আওয়াজ পেয়ে চোখ মেলে চাইতেই দেখলুম এবার আর কিছু নয়—মানুষই বটে ।

কেন্দ্র-স্বাক্ষর

নাড়ু ছুটতে ছুটতে এসে নৌকায় উঠলো। তখনো আমার
সে ভাবটা কাটে নি। নাড়ুর হাত চেপে ধরে বল্লুম—কিসের
আওয়াজ, শুন্তে পাচ্ছিঁস্ ?

সে খানিকক্ষণ কান পেতে শুন্তলে, তারপর হো হো করে
হেসে উঠল।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম—কেন শুন্ততে পাস্নি ? নাড়ু
আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বলে—ভয় পেয়েছিঁস্ নাকি রে ?

আমি সে কথায় কান না দিয়েই বল্লুম—কিসের শব্দ তাই
বল না।

হাসতে হাসতে নাড়ু বলে—আরে বোকা—ও যে মশার
আব্দ !

আমি তো একেবারে চুপ !

নাড়ু বলে আয় শিগ্গীর আমার সঙ্গে—হরিশ মৌকায়
থাকবে। আমি বল্লুম—ওদিকের কি খবর ? নাড়ু—
সব জানতে পারবি—আয় শিগ্গীর। এই বলে সে একরকম
টেনেই আমায় নৌকো থেকে নামাল। ছুটতে ছুটতে যেখানে
গিয়ে পৌঁছুলুম সেটা দারোগা বাড়ীর পেছন দিকটা। দেখি
বিপিন একটা গাছ তলায় বসে আছে। আমাদের আসতে
দেখে সে লাফিয়ে উঠে বলে, ভারী সুবিধা হয়েছে হে ! বাড়ী
শুধু সব এইমাত্র থিয়েটার দেখতে গেল। বাড়ীর ভেতর

এখন এক মাষ্টার এক চাকর, আর বাইরে দ্বারোয়ান ব্যাটার
সব আছে।



আরে বোকা ও যে মশার ডাক!—পৃ: ৫৪

মাষ্টারটাকে হাত করেছি। ওকে কিছু ডাগ দিলেই

শেষাংশ

চলবে। কোন্ ঘরে ছাগ-নন্দন আছেন আমায় দেখিয়ে দিয়ে
মাষ্টারটা এই শু'তে চলে গেল। আমরা বল্লুম, তবে আর
কি—কাজ তো ফসাঁ। কোন্ ঘরে আছে চলো দেখি—

ইসারায় আমাদের থামতে বলে বিপিন চুপি চুপি বললে—
ওহে অত সোজা নয় একটু গোলমেলে আছে। পাঁঠা যে ঘরে
বাঁধা, চাকর বেটা যে সেই ঘরেই ঘুমিয়ে রয়েছে, নইলে
কি আমি এতক্ষণ বসে আছি? নাড়ু একটু ভাবলে তারপর
আমার দিকে তাকিয়ে বললে—নীলে তোর কাছে পয়সা আছে?
আমি পকেটে হাত দিয়ে বল্লুম—আছে একটা আনী। নাড়ু
বললে ওতেই হবে'খন। এই বলে আনীটা বিপিনের হাতে
দিয়ে বললে, যা দিকিন্, বাড়ীর সামনের দোকান
থেকে ছ' পয়সার তেল, আর এক পয়সার সরষে নিয়ে
আয়।

বিপিনকে তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে
দেখে নাড়ু ব্যস্ত হয়ে বললে—তাকিয়ে রয়েছিস্ কেন?
শিগ্গীর নিয়ে আয়। বিপিন ছুটে চলে গেল।

আমি বল্লুম—তেল আর সরষে দিয়ে কি হবে নাড়ু?

নাড়ু বললে—তুই দেখ'তে ছোট আছিস্—তোকেই এক কাজ
করতে হবে।

আমি বল্লুম—কি করতে হবে বল না ছাই—

নাড়ু ফিক্ করে হেসে বলে—আমুক তো আগে, তারপর দেখ্ কি হয়—

একটু বাদেই কাগজে মোড়া কিছু সরষে আর ছোট্ট একটা শিশিতে সরষের তেল নিয়ে বিপিন হাজির হ'ল।

নাড়ু জিজ্ঞেস করলে—কোন ঘরটায় আছে ?

বিপিন রান্নাঘরের পাশে একটা ছোট ঘর দেখিয়ে দিলে। ঘরটার সব দরজা বন্ধ, শুধু একটা জান্না মাত্র খোলা রয়েছে।

নাড়ু আমায় চুপি চুপি বলে—ত্যাখ্ তুই ছোট্ট আছিস্— এই জান্নালা দিয়ে তোকে আমরা হু'জনে উঁচু করে ধরে গলিয়ে দেব। এই ছটো জিনিস্ সঙ্গে নে—

আমি বল্লুম—কি হবে ও-তে ?

নাড়ু বলে—শোন্ না, ভেতরে ঢুকে পাঁঠাটার কানের মধ্যে সরষে ঢেলে দিবি—আর এই তেল লাগিয়ে দিবি জিভে—

আমি বল্লুম—কেন ?

নাড়ু বলে—তা হ'লে পাঁঠাটা আর ডাক্তে পারবে না।

আমি অবাক হয়ে বল্লুম—সত্যি ?

ও বলে—হ্যাঁ, আর ত্যাখ্, তারপর আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে দিবি—আমি আর বিপিন গিয়ে তখন পাঁঠাটাকে তুলে নিয়ে আসবো।





ভিতরে গলিয়ে দিলে—পৃঃ ৫২

আমি ভয়ে ভয়ে বল্লুম—যদি চাকরটা জেগে ওঠে ?

নাড়ু বল্লে—আরে দূর বোকা, টের পাবে কোথেকে ?
তুই তো আগেই গিয়ে পাঁঠাটার ডাক বন্ধ করে দিবি !

রাজী হ'লুম।

হুজনে উঁচু করে ধরে আমায় ভেতরে গলিয়ে দিলে।
চুকেই দেখি কোণে তেলের বাতিটা নিবু নিবু
হয়ে এসেছে। চাকর বেটা বিছানায় পড়ে ভোস্ ভোস্
করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর পাঁঠাটা এক কোণে
শুয়ে কাঁঠালের পাতা চিবুচ্ছে। প্রথমটা আমি থতমত খেয়ে
গেলুম। তারপর কি ভেবে ফস্ করে ফু দিয়ে আলোটা
নিবিয়ে দিলুম। এক বলক্ টাঁদের আলো এসে ঘরে
চুকলো।

আস্তে আস্তে নাড়ুর কথা মত পাঁঠার জিভে তেল ঘসে
দিলুম। শুধু একটিবার ব্যা—আ—শব্দ করেই পাঁঠাটা আর
আওয়াজ করতে পারলে না। আমি তো ওষুধের গুণ দেখে
অবাক্ ! তারপর সরবে গুলো সব কাণে ঢেলে দিলুম।
পাঁঠাটা মরার মত মাটিতে পড়ে রইল !

বাস্ আমার কাজ ফর্সা—

পেছনে চেয়ে দেখি চাকর বেটা বেশ নাক ডাকিয়ে
ঘুমুচ্ছে। আস্তে আস্তে গিয়ে দরজা খুলে দিলুম।

বেশকোরা

নাড়ু, কিস্ কিস্ করে জিজ্ঞেস করলে—ঠিক করেছিস্
তা ?



সব্বে ওলো সব কানে ঢেলে দিলুম—পৃ: ৫২

আমি বল্লুম—হাঁ।

ওরা হুজনে এসে ঘরে ঢুকলো, তারপর পাঁঠাটাকে

ধরাধরি করে বাইরে এনে বল্ল—নীলে, দরজাটা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দে—

দরজা ভেজিয়ে তিনজনে এসে রাস্তা ধরলুম। নাড়ু বল্ল—সদর রাস্তা দিয়ে যাওয়াটা ঠিক নয়। কেউ দেখতে পাবে হয় তো। সোজা গাছের কাঁক দিয়ে চল দেখি—

আমি বল্লুম—সেই ভালো।

নৌকোর ফিরে এসে দেখি ছোটোতেই আরাম করে ঘুমুচ্ছে। তাদের ঠেলে তুলে দিলুম। নাড়ু বল্ল—নৌকোর তক্তা তুলে পাঁঠাটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখ, আর যদি নড়াচড়া করবার চেষ্টা করে তো—একটা কচুর পাতা ওর কাণের ওপর রেখে ছোট্ট একটা ঢিল চাপা দিও। এই বলে পাশ থেকে গোটা কয়েক কচু পাতা তুলে নৌকোর ফেলে দিলুম।

বিপিন বল্ল—তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না ?

নাড়ু বল্ল—না, আমি আর নীলে খেয়া দিয়ে যাবো। ওরা পাঁটার খোঁজ খবর কচ্ছে কিনা একটু দেখে যেতে হবে। তোমরা শিগুঁীর শিগুঁীর চলে যাও।

শেষের কথা

নৌকো ছেড়ে দিলে + নাড়ু আর আমি নিঃশব্দে উপরে উঠে এলুম।

দারোগা বাড়ীর সামনের দিকটায় যেতেই দেখতে পেলুম জনকয়েক দারোগান এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে। আমাদের দেখতে পেয়ে একজন এসে জিজ্ঞেস করল—বাবুজী, ইধার একঠো বকরী দেখা ?

আমরা বল্লুম—এদিকে, কৈ না তো ! লোকটা ছুটতে ছুটতে আর একদিকে চলে গেল। নাড়ু বল্ল, আর দরকার নেই, রুষ্টি আসছে ছুটে চলো।

উপর দিকে তাকিয়ে দেখি এরি মধ্যে প্রায় আধখানা আকাশ কালো কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছে। রুষ্টি এলো বলে। হু'জনে ছুটে চল্লুম। আধ মাইল টাক যেতেই সামনে খেয়া। নদীটা কোনো কালে খুব বড় ছিল। এখন চর পড়তে পড়তে খুবই ছোট হয়ে গেছে। শ্রোতও নেই বলেই চলে।

খেয়ার মাঝি নেই—নৌকোর এধার ওধারে খুব শক্ত রসি দিয়ে ছপারের সঙ্গে বাঁধা। লোকে রসি ধরে নৌকো খানা এপার ওপার টেনে যাতায়াত করে।

নাড়ু বল্ল—শিগ্গীর ওঠ। রসি টেনেতো ছুজনে ওপার গেলুম। আবার ছুটতে যাচ্ছি, নাড়ু বল্ল—থাম। ছুরি

আছে ? পকেট থেকে ছুরি বের করে দিলুম। নাড়ু খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে এপারের সঙ্গে বাঁধা রসিটা কেটে ফেলে দিল।

আমি বল্লুম—ওকি হ'ল ? নাড়ু ছুরিটা আমার পকেটে ফেলে দিয়ে বল্ল—যাঃ ব্যাটারা তু আর খেয়া পার হয়ে এদিক পানে খুঁজতে আসতে পারবে না। তারপর ছুজনে সে কি ছুট—এমন ছোট্টা জীবনে কখনো ছুটেছি বলে মনে পড়ে না। খানিকটা যেতেই মেঘগুলো চাঁদটাকে ঢেকে ফেলে। রাস্তা ঘাট একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। ছুচক্ষে কিছু দেখবার যো'টি নেই। একবার একটা গর্তের মধ্যে পা পড়ে কাপড় খানা ফ্যাসু করে গেল ছিঁড়ে। নাড়ু বল্ল—আমার হাত ধর।

তারপর আবার ছুট্। বিপিনের বাড়ীর কাছাকাছি গেছি এমন সময় বুপ্ বুপ্ করে বৃষ্টি এলো, ভিজতে ভিজতে ওদের বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে উঠলুম। জান্না দিয়ে উঁকি মেরে দেখি ফরাসের উপর তিন মূর্তি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। চৌকীর পায়ার সঙ্গে বাঁধা ছাগ-নন্দন শীতে থর থর করে কাঁপছে।

নাড়ু বল্ল,—দেখেছি—ব্যাটারদের কাণ্ড দেখেছি ? এই বলে জান্না দিয়ে ভেতরে ঢুকে সকলকে টেনে তুল্ল। কাঁচাঘুম ভাঙতেই তারা একসঙ্গে লাফিয়ে উঠে বল্ল—কি—কি—কি হয়েছে ?

বেশপেছোয়া

নাড়ু রেগে বল্ল, হয়েছে আমার মাথা আর তোদের মুণ্ড।
পাঁঠাটাকে যে এখানে বেঁধে রেখেছিস—তোদের এটা মাথায়
এলো না যে, কেউ দেখলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে ?

বিপিন বল্ল—তা কি করবো ? আজকে রাত্তিরের মত
অম্নি থাকবে—কালকে যা হয় একটা ব্যবস্থা করলেই হ'বে।

নাড়ু বল্ল—হ্যাঁ যাতে নাকি একেবারে হাতে হাতে ধরা
পড়ে যাও। সে সব কথা শুনতে চাইনে। আজকে একুনি
খেতে হ'বে।

আমরা সব একসঙ্গে বলে উঠলুম—আজকে—অসম্ভব !

নাড়ু হেসে বল্ল—তার মানেই সম্ভব।

আমি বল্লুম—প্রথম কথা—কাতা কৈ ?

বিপিন বল্ল—কাতার জন্তে আটকাবে না, পাশের ঘরেই
আমাদের পাঁঠা বলি দেবার খড়া রয়েছে।

নাড়ু লাফিয়ে উঠে বল্ল—নিয়ে আয় কাতা। তারপর
নিজেই ছুটে গিয়ে পাশের ঘর থেকে কাতা খানা বের করে
নিয়ে এলো। হরিশের দিকে তাকিয়ে বল্ল—হরিশ, নিয়ে
আয় তো পাঁঠাটাকে জলের ধারে—

হরিশও অম্নি স্বেবোধ বালকের মতো পাঁঠার দড়ি ধরে
টান্তে টান্তে জলের ধারে নিয়ে চল্লো—

আমি চেষ্টা করে বল্লুম—আহা—হা কর কি নাড়ু—

শোনো ;—কিন্তু কার কথা কে শোনে ? নাড়ু ততক্ষণ
পাঁঠার খড় থেকে মাথাটা খসিয়ে দিয়েছে ।



...টান্তে টান্তে জলের খক্কর নিয়ে চলো—পৃঃ ৬৪

বিপিন বল্ল—তারপর এখন কি করবে ?

বেশাভোজ

নাড়ু কাতাখানা রেখে বল্লে—হরিশ, তোমার ওখানে ইক্-মিক্-কুকার আছে—আমি জানি—ওটা এক্সুগি চাই।

হরিশ বল্লে, নৌকো নিয়ে গেলে শিগ্গীর শিগ্গীর নিয়ে আসতে পারি।

নাড়ু আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে,—নীলে নৌকো নিয়ে ওর সঙ্গে যা। তারপর বিপিনের দিকে ফিরে বল্লে বিন্দেকে জাগিয়ে, আমার নাম করে চাল, ঘি, মশলা—যা যা দরকার সব নিয়ে এসো। আমি ততক্ষণে মাংসটা ছাড়িয়ে ফেলি।

কাছেই একটা মুদির দোকান ছিল। রাস্তিরে বিন্দে বলে : একটা ছোকরা দোকান ঘরে শুতো—নাড়ু তার কাছ থেকেই জিনিষ পস্তর নিয়ে আসতে বল্লে। বিপিন চলে গেল দোকানের খোঁজে—আমি আর হরিশ গিয়ে নায় উঠলুম।

ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস—তার ওপর টিপ্-টিপ্ করে তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু উপায় নেই, পাঁঠার সংগতি আজকেই করতে হ'বে—নইলে কালকে আবার ধরা পড়বার বিশেষ সম্ভাবনা।

ভাগ্যিস হরিশের পড়বার ঘরেই কুকারটা ছিল, নইলে অত রাস্তিরে ঐখানেই এক ক্যাসাদ বাঁধিয়ে বসতে হ'ত।

ফিরে এসে দেখি মাংস বানানো হয়ে গেছে, ছালটা দেয়ালের গায়ে ঝুলছে। বিপিন আর অমর ঘাটে চাল ধুচ্ছে।

নাড়ু কুকার জ্বালিয়ে মাংস চাপিয়ে দিলে। তারপর সকলে কুকারের চারদিকে ঘিরে বসে গরম হয়ে গল্প করতে লাগলুম।

নাড়ু বলল,—দেখলি বোকারা শীতের রাত্তিরে কেমন গরম হবার উপায় বাতলে দিলুম। কালকে খেলে কি আর এত রস হ'ত ?

তার কথায় আমরা সকলে সায় দিলুম। ঠিক হ'ল আজকের রাত্তির বিপিনদের ওখানেই কাটাতে হ'বে। খেয়ে দেয়ে আমরা যখন শুয়ে পড়লুম তখন আড়াইটা বেজে গেছে। পরদিন খুব সকালে পাঁচজনে ঘুম থেকে

অমরের বাড়ীতে একটু ভয় ছিল—সে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল। বাড়ীর বাঁধন আমরা তখন অনেকটা কাটিয়েছি, ততটা ভয় আমাদের ছিল না—বসে বসে বেশ আড্ডাটা জমিয়ে তুলেছিলুম—সামনেই ছাগনন্দনের ছালটা ঝুলছিল। তাই কালকের অ্যাড্ভেঞ্চারের কথাই হচ্ছিল বেশী। এমন সময় অমর ছুটতে ছুটতে এসে বলল, সাবধান, পাঁঠা যে আমরা খেয়েছি, তা ওরা কি করে টের পেয়েছে—শুনলুম আমাদের এদিকে একুণি খোঁজ করতে আসবে।

আমরা যেন আকাশ থেকে পড়লুম।

নাড়ু বলল,—কি করে টের পেলে তারা ?

অমর বলল—ওদের কে একজন প্রজা নাকি পাঁঠা আমাদের নৌকায় ভুলতে দেখেছিল—সেই গিয়ে বলে দিয়েছে।

বিপিন তো কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, দাদা যদি টের পায় তো মেরে হাড়গুঁড়ো করে দেবে।

অমর বোধ হয় তখন কাঁপছিল, এইবার খাটের ওপর চুপ করে বসে পড়ে বলল, কি হবে ভাই ? বাবা জানতে পারলে আমায় বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।

হরিশ লাকিয়ে উঠে বলল,—পাঁঠার ছালটা জঙ্গলের ভেতর ফেলে দিয়ে আসি।

নাড়ু শুধু বলল—না।

আমার মনের অবস্থাও যে নেহাৎ ভালো ছিল, তা বলতে পারিনে। বাড়ীতে জানতে পারলে যে রসগোল্লার বাট্টা এগিয়ে দেবে না তা জানতুম। তাই নাড়ুকে বললুম—ছাল ফেলতে তো মানা করলে, কিন্তু উপায় কি হবে ঠাউরিয়েছ কি ?

নাড়ু জবাব দিলে না। বিপিনের দিকে ফিরে শুধু বলল—কালো জুতোর ব্রহ্মা আছে ?

অমর এইবার কেঁদে ফেলে বলল—নাড়ু তোমার কথাই আমরা এমনতর কাজ করলুম। এখন আমাদের বিপদের

মাঝখানে কেলে জুতোর ব্রহ্মের খোঁজ করছ? এই কি তোমার বেড়াবার সময়? হয় তো তুমি পালিয়ে যাচ্বে ভাবছ, কিন্তু আমাদের অবস্থা কি হ'বে বলতো?

নাড়ু—হা—হা—করে হেসে উঠল। ওর হাসি আমাদের কারো কানে ভালো ঠেকলো না। সকলেই নাড়ুর উপর চটে উঠলুম। অনেকটা নাড়ুরই আগ্রহে আমরা একাজে হাত দিয়েছিলাম, এখন ওর এমন ছাড়া ছাড়া ভাব দেখে সকলেই খুব দমে গেলুম।

নাড়ু অমরের পিঠ চাপড়ে বলল—আরে পাগলা ঘাবড়াচ্ছি কেন? তোর কোনো ভয় নেই, এই বলে মায়ের মতো কাছে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিলে। তারপর বিপিনের দিকে আবার ফিরে বলল, জুতার কালো কালী থাকে তো নিয়ে আয় না—

বিপিন একবার আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে কালী আনতে ভেতরে চলে গেল।

নাড়ুকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস না পেলেও এটা কিছুতেই বুঝতে পারলুম না—হঠাৎ জুতোর কালীর তার কি দরকার পড়ল।

বিপিন কালী নিয়ে আসতে নাড়ু কোনো কথা না বলে দেয়াল থেকে ছালটাকে নামিয়ে নিয়ে এলো। তারপর জুতোর ব্রাসে কালী লাগিয়ে ছালটা ঘষতে শুরু করে দিল।

বেশপেরোজা

দেখতে দেখতে সাদা ছালটা একদম কুচুচে কালো হ'য়ে গেল। আমরা অবাক হয়ে সকলে তার কাজ দেখছিলাম। এইবার শুধোলুম একি হচ্ছে নাড়ু? মুচকি হেসে নাড়ু বল্ল—দেখতেই পাবে।

কালী লাগিয়ে ছালটা আবার দেয়ালে ঝুলিয়েছে—ঠিক সেই মুহূর্তে রায় বাবুদের গোমস্তা এসে ঘরে ঢুকলো।

আমাদের তখন একরকম হয়ে এসেছে। হাতে হাতে ধরা পড়বার ভয়ে বুক টিপ্ টিপ্ কচ্ছে—তার শব্দ যেন নিজেই শুনতে পাচ্ছি। ওপর দিকে চাইবার সাহস পর্য্যন্ত তখন আমাদের কারো ছিল না।

লোকটা নাড়ুকে সামনে পেয়ে তার সঙ্গেই কথাবার্তা শুরু করল। শুধোলো তোমরা নাকি কাল রাত্তিরে একটা পাঁঠা নিয়ে এসেছ? নাড়ু ভালো মানুষটির মতো বল্ল, হ্যাঁ। কালকে রাত্তিরে আমরা একটা চড়ুই ভাতির বন্দোবস্ত করেছিলাম—একটা পাঁঠাও মেরেছিলাম।

বল্বামাত্রই—ছেলেটা স্বীকার করবে ভদ্রলোক বোধ হয় ততটা আশা করেননি, তাই—প্রথমটা অবাক হলেও সামলে গিয়ে চোখ গরম করে বল্ল, কে তোমাদের পাঁটা মার্তে বল্ল—সে পাঁটা আমাদের—

নাড়ু যেন আকাশ থেকে পড়ে বল্ল, আপনাদের পাঁটা?

—কৈ—না—আমরা তো পাঁঠা কাল হাট থেকে কিনে এনেছি—এই বলে আঙ্গুল দিয়ে দেয়ালের দিকে দেখিয়ে বলে, ঐ দেখুন না, তার ছাল—

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ হাঁ-করে ছালটার দিকে তাকিয়ে রইল—তারপর বলে—না—এটাতো আমাদের নয়, আমাদের পাঁঠার রং সাদা—বলে ধীরে ধীরে মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নাড়ু মুচুকি হেসে আমাদের দিকে চেয়ে বলল—দেখলি মজা! বিপনে তো সাত তাড়াতাড়ি ছালটা ফেলে দিতে চেয়েছিল।—

বাস্তবিক আমাদের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছিল না। এই মাত্র মস্তবড় একটা ভূত যেন আমাদের ঘাড় থেকে নেমে গেল।

অমর আনন্দে আত্মহারা। চোখ দুটো বড় বড় করে নাড়ুর হাত দুটো চেপে ধরে বলল—সত্যি তুই ভাই মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে এনেছিস্—বাবা যদি কোন রকমে এই কাণ্ড জানতে পারতো, তবে আমার আত্মহত্যা ছাড়া তাঁর হাত থেকে রেহাই পাবার আর কোন উপায় ছিল না।

এই কথা শুনে নাড়ু হো—হো—করে হেসে উঠলো।

অমর বলল—হাসলি যে

নাড়ু হাসতে হাসতে বলে—তোর আত্মহত্যার কথা শুনে।

আমি বল্লুম—কেন তাতে হাসির এমন কি কথা আছে ?

নাড়ু মুখ টিপে বল্ল,—আমিও একবার করতে গিয়েছিলুম
কি না।

একটু এগিয়ে এসে বল্লুম—কি রকম ?

নাড়ু বল্ল—সে এক ভারী মজার গল্প।

যারা শুয়েছিল গল্পের নামে তারাও উঠে ভাল হয়ে বসল।

নাড়ু শুরু করল তবে শোন—তখন আমার বয়স দশ এগারোর
বেশী নয়—কি একটা ছুটুমী করার জন্তে মা আমায়
ঘরে কুলুপ এঁটে বন্ধ করে রেখেছিল। সমস্ত দিন ঘরে
বন্ধ থেকে ভয়ানক রাগ হয়ে গিয়েছিল আমার। বিকেল
বেলা ঘর খুলে খাবার দিতেই থালা ছুড়ে কেলে দিয়ে—
লাফিয়ে উঠোনে এসে বল্লুম—আজ আমি জলি ডুবে মরবো।

মা রেগে বল্ল, যা মরগে যা—আমি ছুটে খিড়কির দোর
দিয়ে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তখনও বেশ সাঁতার
জানতুম। যতই ডুবতে যাই, আমায় যেন কে ঠেলে ভাসিয়ে
তোলে। চেয়ে দেখি ওপরে দাঁড়িয়ে সকলে মজা দেখছে।
মা-ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

দেখে আমার রাগ হ'ল আরো বেশী। কী! আমি
ডুবতে যাচ্ছি—আর সকলে মজা দেখছে। আরো বেশী

করে ডুবতে লাগলাম। কিন্তু ফি বারেই ভেসে উঠি—
ডোবা আর কিছুতে হ'ল না।

এমন রাগ হ'ল আমার! ইচ্ছে হচ্ছিল নিজের গা
নিজেই কামড়াই। করলুম কি একবার ডুব দিয়ে ঘাটের
তলায় এসে চুপটি করে বসে
রইলুম। তক্তার ঘাট, কাঁক দিয়ে
সব দেখা যাচ্ছিল। মা যখন
দেখলে এবার ডুব দিয়ে আর



ঘাটের তলায় এসে চুপটি করে বসে রইলুম

আমি উঠলুম না—তার চোখ ছটো যেন ছলছলিয়ে
এলো। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের পুরোনো চাকর
ভুলুয়া। মা তাকে জলে নামিয়ে দিয়ে বল্লে—দ্যাখতো ও
গেল কোথায়।

বেশপনোয়া

ভুলুয়াতো ডুবে ডুবে সারা। আমাকে আর খুঁজে পায় না। দেখি মা পুকুর ধারে কাদার ভেতর থপ্প করে বসে পড়ল। আমার এমন হাসি পাচ্ছিল, আর থাকতে পারলুম না।

হি—হি করে হেসে উঠলুম। ভুলুয়াটা আমার গলার আওয়াজ পেয়ে ঘাটের তলা থেকে হিড়—হিড় করে আমায় টেনে বের করে উঠু করে একেবারে উঠোনে এনে ফেলল। ঠিক এমনি সময় বাবা আফিস থেকে ফিরে এলেন। সব শুনে বাবা আমার কানটা ধরে গালে গোটা কয়েক চড় মেরে বলেন—হতভাগা ছেলে—ফের এমন করবি? আমি কাঁদো—কাঁদো হ'য়ে চোখ মুছে বলুম—না আর কক্ষণো করবো না।

নাড়ুর আত্মহত্যার কাহিনী শুনে ঘরে একটা হাসির তুফান এলো। মুচুকী হেসে সে বলল,—কিন্তু সে-দিন লোকসানের চাইতে লাভই হয়েছিল আমার বেশী। বিপিন বলল—কি রকম?

হাসতে হাসতে নাড়ু বলল—বাবার হাতে দুটো চড় খেয়েছিলুম বটে, কিন্তু রাত্তিরে মা কোলে বসিয়ে এক বাটা রসগোল্লা খাইয়েছিল—বেশ মনে আছে একসঙ্গে অত রসগোল্লা আর কোঁনদিন খাইনি—বলে মুখ চোটকাতে লাগলো। আমি বলুম—বেশ বেশ, এইতো বীর পুরুষের

লক্ষণ। সেবারের মতো নাড়ুর কপায় আমাদের মস্তবড় একটা কাঁড়া কেটে গেল।

আড্ডায় আড্ডায় ছুটিটা যে ফুরিয়ে এলো তা মোটেই টের পাইনি—যখন টের পেলুম—ইস্কুল খোলবার তখন আর মোটে দুদিন বাকী। ছুটি ফুরোলেই প্রমোশন। পরীক্ষা যে নেহাৎ খারাপ দিয়েছি তা নয়, আমাদের প্রায় সকলেই সংস্কৃতে পণ্ডিত—তার ওপর সোনায় সোহাগা—সারা বছর পণ্ডিতের সঙ্গে ছিল আমাদের আঙুনে কাঁঠালে বীচির সম্পর্ক! কাজেই সংস্কৃতে আমাদের বেশ একটু ভয় ছিল।

সেদিন ছপুর বেলায় আড্ডাটা কিছুতেই তেমন জন্মছিল না। গড়িয়ে—হাইতুলে—সময় যেন আর কাটতে চায় না। হঠাৎ প্রমোশনের ভয় মাথায় ঢুকতেই আমাদের বোধ হয় এমনতর অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। বাইরে আমরা যাই করি না কেন, প্রমোশন না পেলে বাড়ীতে অবস্থা যে নেহাৎ নিরাপদ থাকবে না, সে বেশ ভাল করেই জানতুম। আর জানতুম বলেই আমাদের এমন হেসে-খেলে-উড়িয়ে-দেওয়া দিনগুলো হঠাৎ যেন কেমন বিস্বাদ হ'য়ে উঠল।

লেখকোত্তর।

মাড়ু একবার হাইতুলে বল্লে—চলহে পণ্ডিতের কাছ থেকে নম্বর জেনে আসা যাক্ ।

কথাটায় সকলেই রাজী হ'লুম ।

বিপিন বল্লে—এই রদু'রে ?

আমরা সকলে মিলে তাকে টেনে তুলে বল্লুম—আরে চল না হে জেনেই আসা যাক্ না—এখানে বসেই বা কি করবে শুনি ?—

ঝাঁঝাঁ রদুর—শীতকাল হ'লে কি হ'বে—হাঁটতে হাঁটতে ঘামে জামা ভিজ্লে গেল—চোখ কাণ লাল হয়ে উঠল । পণ্ডিতের বাড়ীর সামনে গিয়ে যখন পৌঁছুলুম—সূর্য্যমামা তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে ।

রোদে পোড়া ঘাসের ওপর বসে পড়ে—জামা খুলে বাতাস খেতে খেতে বিপিন বল্লে—কেন বাবা—বল্লুম তখুনি, খামা বিকেল বেলা যাওয়া যাবে'খন, এখন কোথায় পণ্ডিত ?

তিনি বোধ হয় আরাম্‌সে তাকিয়ায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন । এদিকে তেষ্টায় প্রায় প্রাণ যাবার যোগাড় আর কি ! তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে চৌচিয়ে বল্লে—ঝি—ও—ঝি—।

পা-কাটির বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরকার উঠানের খানিকটা দেখা যাচ্ছিল । চেয়ে দেখি কালো মিশ্‌মিশে মোটা একটা

স্রীলোক বিপিনের আচম্কা ডাক শুনে—একহাত ঘোমটা
টেনে ছুটে পালাচ্ছে।

নাড়ু জিব কেটে বল্লে—ছি-ছি-ছি কি করলি বল দেখি ?

বিপিন বল্লে—কেন ?—ঝিকে ডাকলুম তো ! নাড়ু ধমক্
দিয়ে বল্লে—হ্যাঁ ঝিকে ডাকলে বৈকি ?—ও কে তা জানো ?



—বাঁচতে চাও যদি তো একুশি পালাও সব—

বিপিন বল্লে—কে আবার ?

নাড়ু বল্লে—বাঁচতে চাও যদি তো একুশি পালাও সব-
উনি পণ্ডিত মশায়ের বোঁ ! বিপিন বল্লে—অ্যাঁ ?

বেশরোজা

আর আঁ! যেমনি ও কথা শোনা—সকলে একেবারে
টোঁচা দৌড়—ছুট্—ছুট্—ছুট্ খেলার মাঠে পৌঁছবার আগে
একবার ফিরে তাকাবারও সাহস হয়নি আমাদের !

* * * *

এত কাণ্ড করেও—শেষটা আমরা পাশই করলুম।
প্রমোশনের দিন হেড্‌ মাষ্টার আমাদের সকলকার নামই
ডাকলে দেখে নিশ্চিত হয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

কিন্তু শুধু পাশ করলেই তো হয় না—পাশ করেই ভাবনা
এলো এখন কোথায় পড়তে যাবো ?

গ্রামের ইস্কুলের পড়া ত' আমাদের সাজ হ'ল। আশে
পাশে আর ভাল ইংরেজী ইস্কুল নেই। কাছেই একটা ছোট
সহর। সেখানেই হয়তো যেতে হবে।

আর দলের সকলেই যে সেই সহরেই যাবে তার তো
কোনো মানে নেই, অনেকেই হয়তো অন্য কোনো যায়গায়
আজীব্য বাড়ী থেকেই পড়বে—আবার দূরে যাবার ভয়ে হয়তো
আমাদের কেউ কেউ পড়াই ছেড়ে দেবে। এমনতর অনেক
কথাই আমাদের মনে আসতে লাগলো। দল ভেঙ্গে যাবে
এই রকম একটা আশঙ্কায় আমরা একেবারে ছুয়ে পড়লুম।

এষে আরো হ'ল ভাল। এখন দেখলুম পাশের চাইতে ফেল করাই ছিল আমাদের ভালো। বিদায়ের দিন ক্রমেই এগিয়ে এলো। দল থেকে খসতে খসতে শুধু বাকী রইলুম আমি আর নাড়ু। কেউবা ভিন্ যায়গায় চলে গেল, অনেকেই পড়া ছেড়ে দিলে।

ঠিক হ'ল আমি আর নাড়ু কাছের ছোট্ট সহরটায় একই ইকুলে পড়ব—আর থাকবো সেই ইকুলের বোর্ডিংএ।

যাবার দিন চোখের জলের ভিতর দিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নৌকায় উঠলুম। বিপিন ওরা সব—হাঁটতে হাঁটতে আমাদের নৌকো পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল।

জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটির সঙ্গে চেনা যে যায়গাটা—তাকে ছেড়ে যেতে যে ব্যথা মনের কানায় কানায় ভরে উঠল—তা নিতান্ত আপনার জিনিষ—বাইরে তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই তো! আজ এই মুহূর্তে মনে হ'তে লাগল—এখানকার প্রত্যেকটি গাছ—প্রত্যেক পথের বাঁক—ঐ আম-বাগান—শিউলীতলার ঐ বাঁধানো বেদীটা, কালীবাড়ীর আঙ্গিনা—এমন কি যে পাটক্ষেতের ভেতর ইকুল পালিয়ে লুকোচুরি খেলতুম—তারও প্রত্যেকটি পাতা যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে—যেও না—ওগো—তোমরা যেও না—তোমরা ছুটিতে আমাদের মনের কোণে যে আসন পেতে

বেশপোকা

নিয়েছ, তা পড়ে রইল কি শুধু চোখের জলে ভিজতে ?—
আরো ডাক শুন্তে পেলাম । পলাশবনের মাথা—হাটখোলার
বাঁক—চৌধুরীদের নাটমন্দির—যেন চোখ টিপে টিপে সরে
পড়তে লাগল ।

আজ মনে হ'ল কারো সঙ্গে বিবাদ রইল না আমাদের ।
পণ্ডিত মশাই—চৌধুরীদের পাঁঠা চরাতো যে ছোঁড়া চাকরটা
—ও পাড়ার বিশ্বিন্দুক নমুঠাকুর—এমন কি ইন্স্কুলের
পাখাওয়ালা পর্যন্ত আজ আমাদের ভালো বলে ঠেকতে
লাগল—এবং তাদের হারানোকেও—আমরা মস্ত বড় একটা
ক্ষতি বলে স্বীকার করে নিলাম ।

হোষ্টেলে আমরা দুজনে একটা ঘরেই যায়গা পেলুম ।

এখানে এসে নাড়ু যেন আগেকার ভাল মানুষটা হয়ে
গেল । কারো সঙ্গে আলাপ নেই—দুজনে চুপচাপ ইন্স্কুলে
গিয়ে এক কোণে বসি আবার ছুটি হ'লে ধীরে ধীরে হোষ্টেলে
কিরে আসি । তবে মাঝে মাঝে সন্ধ্যা বেলা আমরা নদীর
ধারে বেড়াতে যেতুম ।

চমৎকার নদী এখানকার । তরতর-বয়ে-যাওয়া নদীর

ধার দিয়ে, সাড়ীর চওড়া পাড়ের মতো চলে গিয়েছে একটা লাল সুরকীর রাস্তা। ঠিক যেন পটুয়ার আঁকা ছবিটি। আর রাস্তার দুধার দিয়ে লম্বা সার সার ঝাউগাছ। শীতের বাতাস নদীর জল কাঁপিয়ে ঝাউ গাছের পাতা ছলিয়ে, শোঁ—শোঁ করে যখন চলে যায়, বেশ লাগে কিন্তু !

সেদিন রবিবার। সন্ধ্যা হয়-হয়। জ্যামিতিটা খুলে সোমবারের পড়াটা একবার চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলুম। নাড়ু খাট থেকে উঠে বসে, সন্ধ্যা বেলা আবার পড়া কিরে ? চল নদীর ধার দিয়ে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

নেহাং আপত্তি ছিল না। আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা টেনে নিয়ে বসুম—চলো। দুজনে যখন হোটেল ছেড়ে রাস্তায় এসে পড়লুম তখন জ্যোৎস্না উঠে গেছে।

শীতের শেষটা। বাতাস ঠাণ্ডা হলেও বেশ মিষ্টি লাগছিল। নদীর ঢেউগুলো টুকুরো টুকুরো চাঁদ বুকে নিয়ে পাড়ে এসে আছড়ে পড়ছিল।

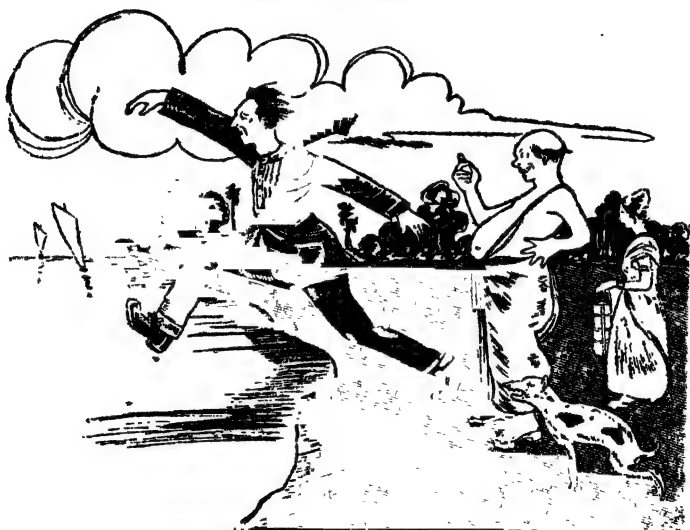
আমরা এগিয়ে চললুম। আরো খানিকটা যেতেই দেখলুম নদীর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাও যেখানটায় বঁকে গেছে সেই মোড়ের মাথায় ভয়ানক ভীড়।

নাড়ু বসে চলতো দেখি ওখানটায় কি হচ্ছে ? দুজনে ভীড় ঠেলে ভেতরে গিয়ে দেখি সে এক মজার ব্যাপার।

শেষের কথা

একটা পাজী ভয়ানক মদ খেয়ে মাতলামী শুরু করে দিয়েছে।
নদীর কিনারায় এমন যায়গাটায় গিয়ে সে দাঁড়িয়েছে যে,
আর একটু হলেই একদম নদীর তলায়! দেখলুম পাজীটা
এক পা তুলে সুর করে গাইছে।—ওড়বার ভঙ্গিতে :—

If the bird can fly
Pray why can't I ?



তার-পর করলে কি হাত পা তুলে নদীতে এক লাফ!
যারা দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল সকলেই হৈ হৈ ক'রে উঠল।
কিন্তু কেউ তাকে এগিয়ে ধরতে গেল না। পলক ফেলতে

নাড়ু করলে কি, কোট্টা আমার গায়ে ছুড়ে কেলে দিয়ে
ঝাঁপিয়ে গিয়ে নদীতে পড়ল। আমি তাকে ধরতে কিছা
মানা কর্তেও সময় পেলাম না।

সকলে হায়-হায় করে উঠল। নদীতে বেশ শ্রোত।
তা ছাড়া ঐটুকু ছেলে কি করে একটা মাতালকে টেনে
তুলবে? আর যদিই বা সে পাজীটাকে টেনে ধরে—তবে
সেও তো প্রাণের ভয়ে মরিয়া হ'য়ে ওকে জড়িয়ে ধরতে
পারে? তখন দুটো শুদ্ধু মারা যাবে যে! এমনি অনেক
কথাই সকলে বলাবলি করতে লাগলো।

আমি যেন আর আমাতে ছিলুম না। মাথাটা কেমন
ঝিম্-ঝিম্ করতে লাগলো, নদীর দিকে তাকাবারও সাহস
রইল না আমার। রাস্তার উপরেই বসে পড়লুম।

এক বুড়ো ভদ্রলোক এসে বল্লেন—ও ছোকরা তোমার
কে হয় বাছা?

আমি বল্লুম—ভাই।

ভদ্রলোক ব্যস্ত হ'য়ে শুধোলেন—আপন ভাই?

আমি বল্লুম—না।

ভদ্রলোক বল্লেন—এই রাস্তা ধরে বরাবর ভাটীর দিকে
চলে যাও—খানিকটা গিয়ে ভেসে উঠবে, ভয় কি?—তিনি
চলে গেলেন।

শেষাংশ

ভাবলুম—ভাই নয় বটে—কিন্তু তার চাইতেও অনেক বেশী। আরো খানিকটা বসে রইলুম—আমার চলবার শক্তি কে যেন কেড়ে নিয়েছিল। যখন উঠলুম, সেখানে তখন আর

কেউ ছিল না। চেয়ে দেখি, সব লোক মজা দেখতে ভাটীর দিকে ছুটেছে। আস্তে আস্তে উঠে আমিও রওনা হ'লুম। দেখলুম, লোকগুলো ছুটে চলেছে—



আগে—আরো আগে—
নদীর দিকে চেয়ে দেখলুম
—ঐ দূরে একটা কি ভেসে
যাচ্ছে না! ছুটে চললুম—
হ্যাঁ নাড়ুই বটে! আরো
খানিকটা এগোতে ওকে



মাথাটা কোলে তুলে নিলুম
স্পষ্ট চেনা যাচ্ছিল। ঢেউয়ের ধাক্কা খেতে খেতে নাড়ু
একেবারে নদীর ধারে ছিটকে এসে পড়ল। আমি ছুটে
গিয়ে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলুম। দেখি, নাড়ুর চোখ

লাল, হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। সে শুধু তার রাজা চোখ দুটো আমার মুখের উপর তুলে ধরে বলে—ভাই, ধরেছিলুম ঠিক তাকে, কিন্তু রাখতে পারলুম না—বলেই হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে গেল। গাড়ী ডেকে নাড়ুকে হোস্টেলে নিয়ে এলুম।

তারপর অনেক রাত্রে তার জ্ঞান হ'য়েছিল। বেশ মনে আছে। এরপর দু'দিন সে কারো সঙ্গে কথাটি কয়নি—শুন্ম হ'য়ে বসে থাকতো। মাঝে মাঝে আমাকে বলতো—বেচারী প্রাণের ভয়ে আমায় এত জোরে আকড়ে ধরলে যে, নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথই রইল না। একটা প্রাণ আমি নিজের দোষে বাঁচাতে পারলুম না—নীলে।

নাড়ুর মরা প্রাণে আবার যে জোয়ার ডেকে নিয়ে এলো তার নাম—সত্য। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা—মুখে যেন হাসি লেগেই আছে। অল্প কোথাও পড়ত সে, তার বাপ এখানে বদলি হওয়াতে, আমাদের সঙ্গে এসে ভর্তি হলো।

সত্যর একটা জিনিষ আমি বরাবরই লক্ষ্য করেছি যে, সে কখনো হাসতে ভোলেনি। হাসি ছিল যেন তার গাছের বারমেসে ফল। নিজেও যেমন হাসতে পারতো—পরকে হাসাবার ক্ষমতাও ছিল তেমনি অসাধারণ।

বেশপনোয়া

সে এক-একজনের কথাবার্তা এমন নকল ক'রে বলতে পারত যে, চোখ বুজে শুন্লে মনে হ'তো,—যার নকল করা হ'চ্ছে, কথা বলছে যেন সে-ই। গলার আওয়াজ পর্যন্ত সে এমন ছবছ ধরে ফেলতো যে—অবাক্ কাণ্ড !

একদিন টিফিনের সময় ক্লাসে বেশ জোর আড্ডা বসে গেছে। নাড়ু বললে—“আচ্ছা সত্য, তুইতো ক্লাসের সকলকার কথাই নকল করতে পারিস্, কৈ হেড্‌মাষ্টারের কথা নকল কর দেখি ? তবে বুঝ্‌বো তোর কেরামতি !”

সত্য হেসে বললে—তবে দেখ্‌বি মজা ?—এই বলে ছ'হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে মোটা গলায় ডাক্লে—“দপ্তরী—দপ্তরী !—”

ঠিক হেড্‌মাষ্টারের গলা ! পাশেই দপ্তরীর একটা ছোট্ট ঘর। ডাক শুনে সে ছুটে এসে আমাদের ক্লাসে ঢুকলো। ক্লাসস্থল সব্বাই হো-হো করে হেসে উঠল। এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে হেড্‌মাষ্টারকে না দেখ্‌তে পেয়ে দপ্তরী ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

ছুটির পর বেরোতেই—দেখি, গেটের সামনে হেড্‌মাষ্টার নিজে দাঁড়িয়ে। পাশে ইস্কুলের দপ্তরী। মাষ্টার মশাই আমাদের ডেকে বল্লেন—“তোমাদের ক্লাসে কে নাকি আমার গলা নকল ক'রে কথা কইতে পারে ?”

বুঝলুম, এ দপ্তরী ব্যাটার কাজ ।

কাউকে কিছু বলতে হ'ল না—সত্য এগিয়ে গিয়ে বললে—
হ্যাঁ স্মার, আপনি যা বলছেন সে কথা সত্য এবং সে কাজ
আমিই করেছি ।

হেড্‌মাষ্টার আমাদের ডেকে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে
গেলেন । বুঝলুম, সত্যকে ফাইন্‌ দিতে হবে ।

হেড্‌মাষ্টার ভেতরকার দরজা বন্ধ করে দিয়ে আর সব
মাষ্টারদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন—এই ছেলেটি নাকি আমার
কথা নকল ক'রে কইতে পারে ! তারপর সত্যকে বল্লেন—
কি বলছিলে বলতো ?

আশ্চর্য্য এই যে, সত্য একটুও দম্লে না । সে দপ্তরীকে
ডাকা—হেড্‌মাষ্টার কি করে পড়ান—কি করে মাষ্টারদের
সঙ্গে কথা বলেন—পড়াতে পড়াতে 'Silence' বলে চ্যাঁচানো,
—হুবহু সব নকল করে বলে গেল ।

মাষ্টাররা সব দেখি রাগে ফুলছে ।

হেড্‌মাষ্টার কিন্তু হেসেই খুন । হাসি থামলে, সত্যকে
কাছে ডেকে নিয়ে বল্লেন—গুণের আদর না করার
মতো মূর্থতা আর নেই—এই বলে তিনি নিজের
হাত থেকে সোনার ঘড়িটা খুলে সত্যের হাতে পরিয়ে
দিলেন ।

শেষাংশ

আমরা হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

দেখতে দেখতে গরমের ছুটি এসে পড়ল। আমি আর নাড়ু আবার আমাদের আস্তানায় ফিরে এলুম। খবর পেয়ে আমাদের দলের সব দেখা করতে ছুটে এলো। যারা বাইরে পড়তে গিয়েছিল—তারাও এসে আস্তে আস্তে জুটল। আবার আড্ডা গুলজার হ'য়ে উঠল।

অমর একদিন এসে বললে—এ রকমভাবে ছ' মাস কি ক'রে কাটবে? চল, একটা কিছু অ্যাডভেঞ্চার করা যাক।

হরিশ টেবিলের ওপর একটা ঘুসি মেরে বললে—হ্যাঁ, নূতন কিছু করতে হয়তো চল,—পায়ে হেঁটে কাশ্মীর। দিব্যি গ্রাণ্ড ট্রান্স রোড দিয়ে পাঞ্জাব অবধি যাওয়া যাবেখ'ন।

নাড়ু হেসে বললে—কাশ্মীর যাবে তোমরা?

আমি বললুম—কেন হবে না—ইচ্ছা থাকলেই হয়।

বিপিন বেশ একটু পেটুক! সে মাথা নেড়ে বললে—না হে না—ও কাশ্মীর টাশ্মির ছেড়ে দাও। তার চাইতে চল, রাস্তিরে ভট্টাচ্য পাড়ায়। দিব্যি তাদের কলা বাগান পেকে পুরুষ্টু হ'য়ে আছে, খাসা নষ্টচন্দ্র হবেখ'ন।

নাড়ু হেসে বলে—হ্যাঁ এ জিনিষটা ঠিক কাশ্মীর যাওয়ার মত শোনাচ্ছে না বটে। তা আপত্তি নেই আমার।

পেটুক বলে বিপিনের একটা বদনাম আছে বটে কিন্তু কাজের বেলায় রাজী হনুম সকলেই। কথাবার্তা রইল—আসছে অমাবস্তার ঘোর অন্ধকারের ভেতর আমাদের রাতের অভিযান শেষ করা হবে।

আমার ওপরেই, সকলকে ডেকে নাড়ুদের বাসায় হাজির হওয়ার ভার ছিল। দলবল নিয়ে যখন ওর বাসায় গিয়ে পৌঁছুলাম সন্ধ্যা তখন উৎরে গেছে। বাইরের ঘরটায় কেউ কোথাও নেই—ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাড়ীর ভেতর খবর পাঠিয়ে জান্নুম নাড়ু খেতে বসেছে। খানিক বাদে নাড়ু জামা কাপড় পরে হাতে একটা ইউকোলিপ্‌টাস্ অয়েলের ছোট্ট শিশি নিয়ে হাজির হলো !

আমি অবাক হ'য়ে বল্লুম—ওকি, তুমি ওখানে যাচ্ছ না নাকি ?

নাড়ু আমাদের সকলকার জামা কাপড়ে একটু একটু করে ইউকোলিপ্‌টাস্ অয়েল মাখিয়ে দিতে দিতে বলে—যাবো সেখানে এটা ঠিক, কিন্তু যে জন্তু যাওয়ার কথা ছিল—সে উদ্দেশ্যে নয়। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্লুম—হেঁয়ালী ছেড়ে আসল কথাটা বল দেখি—ব্যাপারটা কি শুনি-ই না ?

শেষকথা

নাড়ু বলে—ভট্টাচার্য বাড়ীর কলা বাগানের চারদিকে উঁচু দেয়াল তো ?—তাই কোন্ দিক দিয়ে বাগানে ঢোকা সুবিধে হবে সেইটে দেখবার জন্য বিকেল বেলায় ঐ দিকটায় একবার গেছলাম।

আমি বলুম—তারপর ?

নাড়ু বলে—মালী ব্যাটার সঙ্গে আলাপ ক’রে জানলুম, ওবাড়ীর ছোট্ট মেয়েটার আজ ছপুর থেকে কলেরা হ’য়েছে—কিন্তু বাড়ীতে দেখবার নাকি কেউ নেই !

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে—আমি বলে এসেছি সব পালা ক’রে রাত্তিরে থাকবো ওখানে। আমাদের দিকে চেয়ে বলে—কেমন রাজী আছ তো তোমরা সব ?

এখানে কেউ কি মুখ ফুটে বলতে পারে—পারবো না—? আমরাও পারলুম না।

যেখানে ভক্ষক হ’তে যাচ্ছিলুম—রক্ষক হ’য়ে ঢুকতে যে সেখানে একটুও পা কাঁপেনি তা বলতে পারিনে।

তারপর নাড়ুর সে রাত জেগে সেবা করবার কথা—না হয় নাই বলুম। সেবা কি ক’রে করতে হয়, তা চোখের সম্মুখে এতদিন এমনভাবে এসে ধরা দেয়নি। পুরস্কারের আশা না রেখে সেই যে রাতের পর রাত প্রাণপাত পরিশ্রম—আমার তো মনে হয়—তা শুধু নাড়ু বলেই সম্ভব হয়েছিল।

এ কেবল, যে দেখেছে তার আপনার মনে গেঁথে রাখবার মতো, বাইরের বিজ্ঞাপনের ধার সে ধারে না। বেশ মনে আছে, ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে তাকে একদিন চুপি চুপি বলেছিলাম—নাড়ু, এসো আমরা একটা সেবা-সমিতি খুলি ; নিঃস্বের সেবাই হবে সে প্রতিষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিয়ে আমরা কেউ করবো না—আজীবন আমাদের পরের জগতই কাটবে। এম্নিতর ছোট-খাটো বক্তৃতাও একটা দিয়ে ফেলেছিলাম। আজ সে কথা মনে আনতেও লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

নাড়ু আমার হাতটা তার হাতের ভেতর টেনে নিয়ে বলেছিল—কাজ কি ভাই আমাদের নামের গোরেতে ? মনটা যদি চিরদিন এম্নি থাকে তো ওটা কোনো দিনই ভুলবো না।

ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এলো। আমাদের বন্ধ হ'য়েছিল যেমন অল্প সব ইন্সুলের আগে, খুল্লোও তেম্নি সকালে। বন্ধদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জ্যৈষ্ঠের শেষাংশে আমরা আবার ভালো ছেলে সেজে—সরস্বতীর বরপুত্র হবার আশায়—ইন্সুলে ছুটলুম।

গিয়ে দেখি, ইন্সুলের বেশ একটু পরিবর্তন ঘটেছে ; আমাদের আগেকার হেড্‌মাষ্টার চলে গেছেন বদলি হ'য়ে,

আর তাঁর যায়গা দখল করেছেন, মোটা কালো কুচ্-কুচে ভুঁড়িমালা এক বুড়ো মাষ্টার। ছুঁদিনের ব্যবহারেই বেশ বুঝতে পারলুম, হেডমাষ্টার মশায় অযথা ভুঁড়িটির ভার বয়ে বেড়ান না। ওটি তাঁর ছুঁ বুদ্ধি জমিয়ে রাখবার থলি-বিশেষ।

একদিন বিকেল বেলা আমরা ক্লাশের কয়েকটি ছেলে মিলে নদীর ধারে বসে বেশ জটলা কচ্ছিলাম, হঠাৎ পেছন ফিরে দেখি, সান্ধাৎ যমদূতের মত হেডমাষ্টার মশায় তাঁর মোটা লাঠি হাতে করে—ভুঁড়ি বাগিয়ে কখন থেকে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন! আমায় তাকাতে দেখে মোটা গলায় বল্লেন—“এখানে কি কচ্ছ তোমরা?” সকলেই পেছন ফিরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে! আমরা কি বেড়াবার অধিকারও হারিয়ে বসলাম তাঁর আমলে?

কথার জবাব দিলে নাড়ু। সে বল্লেন—নদীর হাওয়া খাচ্ছি স্মার!

হেডমাষ্টার তাঁর ছুঁ ঘুরিয়ে মোটা গলায় বল্লেন—না, এখানে এ রকমভাবে আড্ডা দেওয়া চলবে না তোমাদের।—এই বলে আর একদিকে চলে গেলেন।

ভালো রে ভালো ! নদীর ধারে বেড়াবো—তাতেও মাষ্টারী !

নাড়ু বল্লে—হ্যাঁ, শক্তের ভক্ত, নরমের ষম—রোসো বাছাধনকে একটু মজা দেখাতে হচ্ছে ।

পরদিন ইস্কুল ছুটির পর নাড়ু আমাদের চুপি চুপি ডেকে নিয়ে শুধোলে—কি রে কিছু বুঝতে পারলি ?

আমি বল্লুম—কিসের কি ?

নাড়ু বল্লে—দূর বোকা ! হেড্‌মাষ্টার আমাদের পেছনে চর লাগিয়েছে, তা জানিস্ ?

সত্য যেন আকাশ থেকে পড়ে বল্লে—চর কি রকম ?

নাড়ু হেসে বল্লে—আর কি রকম ! টিফিনের ঘণ্টায় হেড্‌মাষ্টারের কামরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম । ঘরের ভেতর ফিস্-ফিস্ আওয়াজ শুনে জান্‌লার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ছু'টো ছেলেকে হেড্‌মাষ্টার আমাদের খোঁজ-খবর নিতে বল্ছে—আর আমরা কখন কি করি সব সময় পেছন পেছন থেকে তা জেনে, হেড্‌মাষ্টারকে বলতে হবে ।

আমি বল্লুম—তার মানে ? আমরা কি চোর, না ডাকাত ?

নাড়ু বল্লে—চোরই হই—আর ডাকাতই হই—মোট কথা, আমাদের পেছনে ফেউ লেগেছে ।

শেষকথা

সত্য বল্লে—ছেলে-ছ’টো কোন্ ক্লাসের বল্লেতে পারিস্ ?

নাড়ু চোখ বুজে একটু মাথা চুল্কে বল্লে—বোধ হয় ফার্স্ট ক্লাসের হবে। তবে এটা ঠিক, ওদের শায়েস্তা না করলে চল্ছে না।

সত্য বল্লে—নিশ্চয়ই।—

নাড়ু বল্লে—তোরা খেয়ে-দেয়ে নদীর ধারে গিয়ে আমার জন্তু অপেক্ষা করবি। আমি বাড়ী থেকে ঘুরে আসছি।

তিন জনে যখন নদীর ধারে গিয়ে মিল্লুম, তখনও একটু বেলা আছে।

নাড়ু বল্লে—চল্ এক জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।

আমি বল্লুম—কোথায় ?

নাড়ু বল্লে—আয় না আমার সঙ্গে।

নদীর রাস্তা ছেড়ে পুরোনো বাগের রাস্তা ধরলুম। সহরের শেষটায় একটা পোড়ো জায়গা—লোকের বসতি নেই—জায়গাটা একেবারে জঙ্গলে ভর্তি। প্রবাদ আছে, কোনও কালে নাকি নামকরা এক জমিদার ছিল এইখানটায়। তার অত্যাচারে প্রজারা একেবারে অতিষ্ঠ হ’য়ে উঠেছিল। শেষটা আর টিকতে না পেরে প্রজারা বিদ্রোহী হ’য়ে রাতারাতি জমিদার বাড়ী চড়াও করে সব খুন ক’রে ফেলে। বংশে বাতি দেবারও নাকি কেউ ছিল না। একে সন্ধ্যা ঘনিয়ে

আসছিল, তার ওপর জায়গাটার এমন একটা ভীষণ কঙ্কালসার মূর্তি দেখে, প্রাণটা আপনিই ছম্-ছম্ করে উঠছিল।

নাড়ু গিয়ে একেবারে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল।
বল্লে—পেছন-পেছন আয়।

আমাদের দেখে ছুঁটো শেয়াল গর্ভ থেকে লাফিয়ে উঠে পালিয়ে গেল।

আমি বল্লুম—জঙ্গলের ভেতর এ সন্ধ্যাবেলা কি হবে?

নাড়ু শুধু বল্লে—দরকার আছে।

চল্লুম তার পেছন-পেছন। মাথার ওপর দিয়ে একটা কাল পাঁচা বিকট শব্দ ক'রে চ'লে গেল। আরো খানিকটা গিয়ে দেখি, পোড়ো-বাড়ীর একটা ভাঙ্গা সিঁড়ি যেন প্রেতের মত দাঁত বের করে পাহারা দিচ্ছে।

নাড়ু বল্লে—এইখানে আমরা বসবো।

সকলে গিয়ে তার ওপরে বসলুম। সিঁড়ির তলা থেকে গোটা কয়েক বাহুড় ঝট্-পট্ করে বেরিয়ে আমাদের গায়ে ডানার ঝাপটা মেরে চ'লে গেল।

নাড়ু পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই বের করে বল্লে—নে ধরা একটা করে।

আমি বল্লুম—নাড়ু এ সব কি?

নাড়ু বল্লে—আরে বোকা, ফেউ ছুঁটো আমাদের পেছ

শেষদ্রোহ

নিয়েছে। ওদের দেখাতে হবে—আমরা সব বখাটে ছেলে—
এইরকম জায়গায় আমাদের রোজ আড্ডা বসে। মুখের
দিকে হাঁ ক’রে রয়েছিস্ কি? তুই তো সত্যি সিগারেট
খাচ্ছিস্ নে, শুধু ধরিয়ে বোসে থাক্ না।

আমি বল্লুম—ওদের এসব দেখিয়ে লাভ ?

নাড়ু চোখ বুজে বল্লে—দরকার আছে।

আর আপত্তি না করে ওর কথামতই কাজ কর্লুম।

নাড়ু আপন মনেই বলতে লাগলো—ব্যাটারা হেড-
মাষ্টারকে গিয়ে সব লাগাবে—ভারী মজা হবে কাল্কে।

পুরোনো বাগ থেকে যখন ফিরে এসে হোস্টেলে ঢুক্লুম—
ঢং-ঢং ক’রে তখন ঘড়িতে আটটা বাজল।

~~নাড়ু বল্লে—কাল্কেও যতে হবে কিন্তু!~~

পরদিন বিকেলবেলা আবার সকলে পুরোনো বাগের দিকে
রওনা হ’লুম। যাচ্ছিলুম বটে, কিন্তু নাড়ুর সত্যিকারের
ইচ্ছেটা যে কি, তা বুঝতে না পেরে মনটা সন্দেহের দোলায়
তুলছিল। আজকে নাড়ু আরো নিবিড় জঙ্গলে ঢুকতে
লাগল। আমি জিজ্ঞেস কর্লুম—তারা যে সত্যি আমাদের
পেছন-পেছন এসেছে, তা কি ক’রে জানলি ?

নাড়ু মুচ্কি হেসে বল্লে—আজকে শুধু ফেউ নয়—পেছনে
বাঘও আছে।

আমি অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলুম—সেকি ? হেড্‌মাষ্টার
মশাইও সঙ্গে আছেন নাকি ?

নাড়ু শুধু বল—‘হু’ ।

নিঃশব্দে সকলে চলতে লাগলুম । আরো খানিকটা গিয়ে
দেখলুম সামনে বেত কাঁটার মস্ত বড় ঝোঁপ । বললুম—এর
ভেতরেও ঢুকতে হবে নাকি ?

নাড়ু বল—‘হু’ ।

ওতো ‘হু’ বলেই খালাস ! এদিকে আমাদের তো প্রাণ
বায় ।

বেত ঝোঁপ থেকে এক একটা ডাঁটার আগা ছাড়িয়ে
ছাড়িয়ে নাড়ু আমাদের দিয়ে বল্ল—টান্—

টেনে টেনে জায়গাটা বেশ কাঁকা হ'তে দেখলুম—ভেতরে
দুব্বি একটা পরিষ্কার রাস্তা হয়ে গেছে । পকেট থেকে এক
বাঙালি সূতো বের ক'রে বল্ল—প্রত্যেকটি ডাঁটার আগা
পাশের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখ । আমরা নাড়ুর কথা মত
সেই রকমটি ক'রে তার পেছু পেছু নূতন-পাওয়া-রাস্তা দিয়ে
ভেতরে ঢুকে গেলুম । খানিকটা গিয়ে নাড়ু বল্ল—চুপ, কথা
ক'স্নি আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাক্ ।

একটু বাদেই দেখি ছোটো ছেলের সঙ্গে আমাদের হেড্-
মাষ্টার মশাই পা টিপে টিপে এই দিকে আসছে । বেত

বেশরোজা

কোঁপের ভেতর দিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে ছেলে ছটো বোধ হয়
হেড্‌মাষ্টারকে ফিস্ ফিস্ করে বল্ল—এই পথেই তারা গেছে।
হেড্‌মাষ্টারও মাথা নেড়ে সেই রাস্তায় নেমে পড়লেন।

নাড়ু চুপি চুপি বল্ল—ছপাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে সূতো গুলো
কেটে দাও। আমরাও তার কথা মতো ছুভাগে ছপাশ দিয়ে
গিয়ে ছুরি দিয়ে কচাকচ্ সূতো কেটে ফেল্লুম। আর যাবে
কোথা? বেত কাঁটা গুলো ছিলে-হেঁড়া ধনুকের মতো ভুঁড়ি
শুদ্ধ হেড্‌মাষ্টার ও আর ছেলে ছটোকে জড়িয়ে ধরল।

আমরা ততক্ষণ পগার পার! পরদিন সকাল বেলা
শুন্লুম হেড্‌মাষ্টারকে নাকি পুরাণো বাগের মুখে
খেক্‌শেয়ালীতে ধরেছিল। শরীরের এমন জায়গা নেই
যেখানে নাকি আঁচড়-কামড়ের দাগ না আছে! কাপড়,
জামা টামা শুদ্ধ নাকি সব ছিঁড়ে গেছে।

আমরা বল্লুম—তবু যে প্রাণে প্রাণে বেঁচে এসেছেন তাই
রক্ষা—নইলে আমাদের দশাটা কি হ'তো!

পরদিন ইস্কুলে যেতেই নাড়ুকে ডেকে নিয়ে গেলেন
তঁার খাস্ কামরায়।

দরজার কাঁক দিয়ে দেখি খানিক বাদে দপ্তরী একগাছা
লিক্লিকে বেত এনে হাজির করল। হেড্‌মাষ্টার নাড়ুর
দিকে চেয়ে বল্লেন কাল্‌কে কোথায় গেছলে শুনি?

নাড়ু অবাক হ'য়ে বল্ল—কোথায় স্মার ?

হেড্‌মাষ্টার রেগে বল্লেন কোথায় জান না ?—রোসো দেখিয়ে দিচ্ছি—এই বলে সপাং করে নাড়ুর গায়ে এক বেত !
নাড়ু আস্তে কিন্তু বেশ জোরের সঙ্গে বল্ল—মারবেন না স্মার—

‘না মারবো না—মাখন খেতে দেবো’ বলে যেই আর এক ঘা মারতে গেছেন অমনি নাড়ু খপ্ করে বেতটা ধরে ফেলে—ছু'খানা ক'রে—জান্‌লা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিল ।

হেড্‌মাষ্টার বোধ হয় এতটা আশা করেন নি— ! চোখ দেখে বুঝলুম ভয়ানক ভয় পেয়ে গেছেন তিনি ।

তঁার হাত থর্-থর্ ক'রে কাঁপতে লাগলো ।

খানিকক্ষণ মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না । তারপর আস্তে আস্তে বল্লেন—যাও, ক্লাসে যাও ।

নাড়ু আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

এই ঘটনার ৫৭ দিন পর একদিন সকালে উঠে ভূগোলটা ভালো ক'রে তৈরী করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দরজার কাছে চেনা গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম—“মশায়, নীলু বলে কেউ এখানে থাকে ?” দরজার কাঁক দিয়ে মুখ বার ক'রে দেখি, আমাদের অমর কুলীর মাথায় বাস্ত্র-বিছানা চাপিয়ে এসে হাজির । আমি বল্লুম—
অমর কোথেকে হে ?

শব্দোচ্ছ্বাস

সে বল—ভাই, তোদের এখানেই থাকবো।



দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বা'র করে দেখি...পৃঃ ৯৯

আমি বলুম—তার মানে ?

অনেক ব্যাখ্যা ক'রে সে যা বললে—তা'তে এইটুকু বোঝা গেল যে, অমর যেখানটায় পড়ত, স্বাস্থ্য তার সেখানে মোটেই টিকছে না—কাজেই তার বাবা নাকি ব'লেছেন—নীলেরা যেখানে আছে, সেখানে গিয়ে পড়াশুনা কর ।

আমি বল্লুম—তা হ'লে নীলের ওপর তোর বাবার খুব ভালো ধারণা আছে বল্ ?

অমর হেসে বললে—নিশ্চয় ।

অমরের এখানে এসে লাভের চাইতে লোকসানই হ'ল বেশী । বছরের মাঝখানটায় সবগুলো বই বদলে যাওয়ায় বেচারী বেশ একটু মুস্থিলে পড়ে গেল । সে অনেক রাত জেগে পড়ত বটে কিন্তু কিছুতেই তেমন সুবিধে ক'রে উঠতে পারতো না । তার ওপর সামনেই হাফ-ইয়ার্লি একুজামিন্ ।

একুজামিনের দিন সাতেক আগে হোস্টেলের একটা বড় রকমের ফিষ্ট খেয়ে সেদিন আর পড়তে মন বসলো না । বালিশটা টেনে নিয়ে সকাল-সকাল শুয়ে পড়লুম । রাত প্রায় ছ'টোর সময় হঠাৎ ঘুম ভাঙতে চেয়ে দেখি—অন্ধকার ঘরের একটা পাশ আলো ক'রে অমরের শিয়রে আলো জ্বলছে, আর বিছানার ওপর বসে অমর ছ' হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ।

শেষপর্বোত্তর

লাফিয়ে উঠে তার হাত ছ'টো মুখ থেকে টেনে নিয়ে
বল্লুম—কি হ'ল রে ?

ধরা প'ড়ে অমরের লুকোনো কান্না আর চাপা রইল না—
সে আরো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল ।

কান্না শুনে নাড়ু লাফিয়ে উঠে এসে বল্লে—ব্যাপার কি ?

নাড়ুর অনেক সাধ্য-সাধনার পর অমর বল্লে যে—সে
কিছুতেই পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না—আর সে কথা
যদি তার বাবার কানে যায় তো তিনি তা'কে বাড়ী থেকে
তাড়িয়ে দেবেন ।

নাড়ু খিল-খিল ক'রে হেসে বল্লে—তাই রাত ছ'টোর
সময় মরা-কান্না শুরু ক'রে আমাদের ঘুমুতে দিবি নে ?

অমর চোখের জল জামার হাতায় মুছে বল্লে—ঠাট্টা নয়
ভাই—তাকে আমি সত্যি ক'রে বলছি ।

নাড়ু বল্লে—আহা, আমি বলছি তোমার প্রশ্ন চুরি ক'রে
এনে দেবো । হ'ল তো—যা এখন ঘুমোগে ।

আমি বল্লুম—সেকি ? প্রশ্ন তুমি পাবে কোথায় ?

নাড়ু বিছানায় শুয়ে প'ড়ে চোখ বুজে বল্লে—সে হবে
একরকম ক'রে—বল্লুম যখন—তখন আর কিছুর জন্তে আটকা
থাকবে না ।

তা জানতুম । নাড়ুর মত 'হ্যাঁ' কে 'না' করতে পারে,

এমনতর কেউ জগতে ছিল কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু আমার কেমন মন সর্ছিল না। এই সেদিন হেড্‌মাষ্টারের সঙ্গে একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল! তাই আস্তে আস্তে বল্লুম—কাজ নেই ভাই ও-সবে।

নাড়ু আমায় ধমক্ দিয়ে বল্লে—তুমিও আবার মরা-কান্না শুরু করলে—আজ কি ঘুমোতে দেবে না নাকি?

এরপর আর কথা চলে না—কাজেই চুপ ক'রে গেলুম।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে খাটের ওপর বসে নাড়ু ঠাঁপাতে লাগলো।

জিজ্ঞেস করলুম—ব্যাপার কি?

বল্লে—চুপ—কোশেচন্ এনেছি।

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লুম!

অমর হাঁ করে নাড়ুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

নাড়ু বল্লে—প্রেস থেকে আজই কোশেচন্ হেড্‌মাষ্টারের কাছে এসে পৌঁচেছে। হাত-বাক্সের ভেতর বন্ধ ক'রে হেড্‌মাষ্টার গেছেন, বোনের বাসায় বেড়াতে। তাঁর ভাইপোকে এক সের চম্-চম্ খাইয়ে তবে অনেক কষ্টে রাজী

বেশপেছোয়া

করলুম। তারপর সে ছুপি ছুপি চাবি এনে দিতে কোশ্চেন্-
গুলি নিয়ে এলুম। অবশ্য তারো এতে লাভ হ'য়েছে।
জন্মের ক্লাসের কোশ্চেন্ও একখানা ক'রে দিলুম কিনা।
নিজের নেবার সাহস নেই অথচ আমাকে দিয়ে কাজ হাঁসিল
করলে।

হেড্‌মাষ্টারের ভাইপো আমাদের নীচের ক্লাসে পড়ে,
তা জানি। বল্লুম—হেড্‌মাষ্টার এসে যখন টের পাবে তখন ?

নাড়ু হেসে বল্লে—তা আর জানবার যো-টি নেই।
প্রত্যেক পেপারের একখানা ক'রে কোশ্চেন্ নিয়ে আবার
যেমনটি খামে মোড়া ছিল, তেমন ক'রে রেখে এসেছি। তা
ছাড়া হেড্‌মাষ্টার নিজে তো আর খাম খুলবে না। মাষ্টারদের
হাতে দিয়ে দেবে। ছ' চারখানা বেশী ছাপা কি আর
না থাকে ?

সেই প্রশ্ন নিয়ে অমর ছ'টো দিন, ছ'টো রাত প্রায় ঠায়
ব'সে কাটিয়ে দিলে।

ইংরেজী পরীক্ষার পর নাড়ু অমরকে জিজ্ঞেস্ কল্লে—
কেমন একজামিন্ দিলি রে ?

একগাল হেসে অমর বল্লে—দিয়েছি বেশ ভালো।

তারপর একে একে সব পরীক্ষাই হ'য়ে গেল। আশ্চর্য্য
এই যে, নাড়ু সত্যি-সত্যিই ধরা পড়ল না। তবে আমরা

শুনলুম—ভাইপোকে সব বিষয়েই ভালো নম্বর পেতে দেখে
হেড্‌মাষ্টার নাকি ব'লেছিলেন—কান্না নিশ্চয়ই নকল ক'রে
লিখেছে, নৈলে ও কি ক'রে এত নম্বর পেলে ?

বাস্ এই পর্য্যন্তই—এ ছাড়া আর কোনো কথা হয়নি।

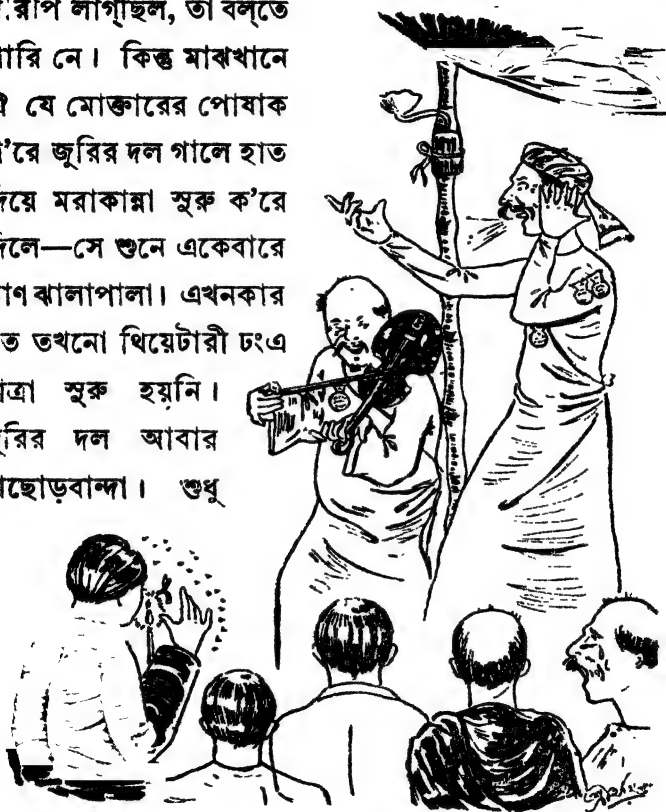
এর দিন কয়েক পর সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শুনলুম
—কোথেকে খুব নাম-করা এক যাত্রার দল এসেছে। বাজারে
তিনদিন উপরা উপরি যাত্রা হবে।

এইখানে একটু কিছু বলা দরকার মনে করি। ফি বছরই
এই সময়টায় স্থানীয় বাজারে খুব ধুমধাম ক'রে কালীপূজা
হয়, আর সেই সঙ্গে নানারকম আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা
থাকে। গত বছর এই উপলক্ষে খুব বড় একদল সার্কাস
এসে নানারকম খেলা দেখিয়ে গেছিল। ছেলের দল আজও
- সেই কথায় লাফিয়ে ওঠে। এ বছরও উপরা উপরি তিনদিন
যাত্রা হবে শুনে ছেলের দল খুব মেতে উঠল। হোস্টেলের
ছেলেদেরই আমোদ সব চাইতে বেশী। কারণ, বাড়ীতে
থেকে যারা পড়াশুনা করে, সব দিন দেখবার অল্পমতি তারা
পায় না। কিন্তু হোস্টেলের ছেলেরা পালিয়ে গিয়ে সে
অল্পমতির হাত থেকে রেহাই পায়।

ফি বছরের মত হোস্টেলের ছেলেদেরও নেমস্তন্ন ছিল—
যাত্রা শোন্‌বার।

শেষেরোহা

প্রথম দিন আমরা সব পালিয়ে গেলুম। যাত্রা যে খুব
খারাপ লাগছিল, তা বলতে
পারি নে। কিন্তু মাঝখানে
ঐ যে মোক্তারের পোষাক
প'রে জুরির দল গালে হাত
দিয়ে মরাকান্না শুরু ক'রে
দিলে—সে শুনে একেবারে
কাণ ঝালাপালা। এখনকার
মত তখনো থিয়েটারী ঢংএ
যাত্রা শুরু হয়নি।
জুরির দল আবার
নাছোড়বান্দা। শুধু



গালে হাত দিয়ে মরাকান্না শুরু করে দিল—
একবার গেয়েই ওদের মনের আশা মেটে না—প্রত্যেকে

চারদিকে ঘুরে-ঘুরে গাইবে—তবে নিস্তার। এ যেন কে কৃতটা হাঁ করতে পারে তার একটা রীতিমত যুদ্ধ।

নাড়ু বল্লে—নাঃ, এ মোক্তারের দল তো বড় জ্বালাতন কর্লে ?

পাশে আর একটি ছেলে বল্লে—এরা আমাদের না তাড়িয়ে ছাড়বে না দেখছি।

নাড়ু বল্লে—আমাদের তাড়াবে ? রোসো, মজা দেখাচ্ছি।

পাশেই ছিল একটা গ্যাস্-লাইট, তাতে নানারকম পোকা এসে উড়ে পড়ছিল। নাড়ু কর্লে কি—সেই থেকে না পোকা ধরে তাল পাকিয়ে জুরিদের মুখের মধ্যে ছুঁড়ে মারতে লাগল। বেচারী হয়তো মনের আবেগে চোখ বুজে কাণে হাত দিয়ে, মস্ত বড় এক হাঁ ক’রে সবে গান শুরু করেছে, হঠাৎ নাড়ুর অব্যর্থ গুলি গিয়ে পড়ল তার মুখের মধ্যে—পোকাগুলো ততক্ষণে গলার মধ্যে ঢুকে গেছে। বেচারী তখন গান থামিয়ে সাজঘরের দিকে দে ছুট! এইরকম খানিকক্ষণ কর্তে দেখি, সত্যি-সত্যিই মোক্তাররা সব ব্যবসা ছেড়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে।

তারপর বেশ আরামে গান শোনা গেল। শেষশব্দে গান শেষ হ’তে সব হোষ্টেলে ফিরে এসে লম্বা ঘুম!—এক ঘুমে বিকেল।

বেশপেছানো

বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে শুনি, আজকের পালা নাকি আরো ভালো। সকলেরই মন উড়ু উড়ু করতে লাগলো। কিন্তু হেড্‌মাষ্টারের কড়া হুকুম—হোষ্টেলের ছেলেরা একদিনের বেশী রাত জাগতে পারবে না।

নাড়ু বললে—রেখে দে তোর হেড্‌মাষ্টারের হুকুম—রাস্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেশ পালিয়ে যাওয়া যাবেখ'ন।

সত্য বললে—তাই ভালো। শুনছি—আজকে নাকি পালাটা একটু দেরী ক'রে শুরু হবে।

রাস্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে ব'সে গল্প করছি, সত্য এসে খবর দিলে—সুপারিন্টেন্ডেন্ট দরজা বন্ধ ক'রে শু'য়ে পড়েছে।

জামা গায়ে দিয়ে আমরা গুটি-গুটি সব বেরিয়ে পড়লুম। সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে এক ভদ্রলোক এসে আমাদের এক জায়গায় বসিয়ে দিলেন। পালাটা ছিল বোধ হয় মহিষাসুর বধ। খুব মজা ক'রে যুদ্ধ দেখছি—হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে পেছন ফিরে দেখি, আমাদের হোষ্টেলেরই একটি ছেলের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের বচসা হ'চ্ছে।

নাড়ু বললে—চলতো দেখি, কি হ'চ্ছে ওখানে?

মহিষাসুরের যুদ্ধ দেখতে তখন এত ব্যস্ত যে, ওঠবার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিল না। বললুম—কি আবার হবে,

গোলমাল-টোলমাল হ'য়েছে বোধ হয়—একুনি মিটে যাবে'ন।

আমার হাত ধরে টেনে তুলে নাড়ু বললে—না—না চল—
নিতান্ত অনিচ্ছায় সেখানে পৌঁছে দেখি—আজ অনেক-
দূর গড়িয়েছে।

ব্যাপার এই—বাজারের কর্তার জনকয়েক কর্মচারী
এয়েছেন—যাত্রা শুন্তে—তাই ^৫ ^{১৫} উঠে নাকি তাদের
জন্তে যায়গা করে দিতে দিবে।

ছেলেটা নানা রকমে বোঝাবার চেষ্টা করছে যে, তাদের
এইখানেই বসতে দেওয়া হ'য়েছে, কর্মচারীদের অন্য কোথাও
যায়গা ক'রে দেওয়া ভালো।

কিন্তু যে ভদ্রলোক যায়গা করতে এসেছিলেন, তিনি সে
কথাটা কিছু বুঝেছেন এ রকম কোনই ভাব দেখা গেল না।
বরং হঠাৎ যেন পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপে উঠে ছেলেটার
হাত ধরে টান দিয়ে বল্লেন—না, তোমরা এখানে বসতে
পারবে না।

আর যাবে কোথা—নাড়ু ছিল আমার পাশে দাঁড়িয়ে—
সে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের ঠিক নাকের ডগার ওপর এক
ঝুসি মেরে বললে—মশাই, নেমস্তন্ন ক'রে এনেছেন—মে-টা
খোয়াল আছে?

বেশকোমরা

আচম্কা এই রকম একটা ঘটনায় আসরে ভীষণ হৈ-চৈ
চীৎকার উঠল। কর্মচারীর দল এসে নাড়ুর ওপর কুণ্ঠ



নাকের ডগার ওপর এক ঘুসি...

দাঁড়াল—হোটেলের ছেলের দলও নেহাৎ কিম নয়!
আসরের চারিদিকে যে সব বাঁশ পোতা ছিল, তাই তুলে

নিয়ে তারাও নূতন ক'রে মহিষাসুরের পালা শুরু ক'রে দিল।

সত্য আমার কাণে ফিস্-ফিস্ ক'রে বল্লে—শিগগীর ছুটে গিয়ে হোস্টেলের ছেলেদের খবর দে—ততক্ষণে চারদিকে মার-মার রব উঠে গেছে।

পাঁচিল টপকে গিয়ে হোস্টেলে খবর দিতেই—টেনিস, ব্যাটেক্ট যে যা সাম্নে পেল নিয়ে ছুট-ছুট।

প্রথমটা আমাদের দলটা ছিল নেহাৎই কম, এইবার নতুন দল আসতে দেখে তারা যেন দ্বিগুণ বল পেল—তার ওপর নাড়ু আর সত্যের জীমনাস্টিক করা শরীর—ওরা দু'জনেই প্রায় একশো। শুধু মার-মার চীৎকার। খানিক বাদে বাজারের লোক যে কে কোথা দিয়ে সটকে পড়ল তার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। মাঝখান থেকে বড় বড় সব ঝাড় লঠন গুঁড়িয়ে একসা হ'য়ে গেল। শেষটায় দেখা গেল মারামারির ফলে আমাদের দলের একটি ছেলের একখানা পা ভেঙ্গে গেছে, তাকে কাঁধে তুলে আমরা তক্ষুণি হোস্টেলে ফিরে এলুম।

পরদিন সুপারিটেণ্ডেন্টের হুমকিতে মারামারির সব খবর বেরিয়ে পড়ল এবং এও জানতে বাকি রইল না যে এ মারামারির নেতা আমাদেরই নাড়ু।

শেষপত্রোত্তর

পরদিন ক্লাশে যেতে হেডমাষ্টার ইস্কুল ছুটি দিয়ে আমাদের মতো সব দাগী আসামীদের ডেকে পাঠালেন।

কড়া বিচারে সকলকার পাঁচ টাকা করে জরিমানা হ'ল। সব শেষে তিনি নাড়ুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরমুখে বল্লেন, “আমি জানি—তুমিই এ ছুফর্মের নেতা—। একমাস তুমি কারো সঙ্গে কথা বলতে পারবে না—আর সকলকার সামনে নাকে খৎ দিতে হ'বে—যা'তে আর এমনটি না হয়।

নাড়ু মাথা উচু করে বল্ল—তা' আমি পারবো না স্যার। হেডমাষ্টার ফোস্ করে উঠে জবাব দিলেন—৭দিন তোমায় সময় দিলুম—এর মধ্যে ভেবে ঠিক কর। হয় আমার কথা মত কাজ করতে হবে—নইলে ডিরেক্টর আপিসে জানিয়ে তোমায় আমি রাষ্ট্রিকেট করবো।

নাড়ুকে নিয়ে আমরা সবাই চলে এলুম। সকলকার মনেই যেন কি একটা অনিশ্চিত আশঙ্কা কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগলো।

সাতটা দিন বইত নয়! দেখতে দেখতে কেটে গেল!

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে হ'ল—আজ কি যেন একটা কাণ্ডই না ঘটে—নাড়ুকে আমি ভালো করেই জানি সে ভাঙ্কে কিন্তু মচকাবে না।

হঠাৎ নাড়ুর বিছানার দিকে তাকাতেই প্রাণটা ছাঁৎ করে উঠল। একি খাট খালি যে!

ছ'পা এগোতেই বিছানায় একটা চিঠির ওপর নজর পড়ল। চিঠিটা এই—

ভাই নীলু,

এতদিনের মেলামেশার ফলে যদি আমায় চিনে থাকিস্ ত' এটা হয়ত বেশ ভালো করেই বুঝেছিস্ যে আমার এই বেপরোয়া জীবনে কারো কাছে মাথা নীচু আমি করিনি—করবো না, আমি এ দেশ ছেড়ে চল্লুম। আমেরিকা যাওয়ার একটা হঠাৎ-পাওয়া-সুযোগ আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। কি করে যাচ্ছি—কেন যাচ্ছি—তা তোর সঙ্গে ছাখা করে বল্লুম না—কারণ, জানি তা হ'লে তুই আমার যাওয়ার পথে বাধা হবি। যদি কখনো মানুষ হ'য়ে ফিরতে পারি, তবেই তোদের সঙ্গে জীবনে আবার সাক্ষাৎ হ'বে—নইলে এই শেষ।

তোদের নাড়ু

ঝুপু করে বিছানার ওপর বসে পড়লুম।

নাড়ুর বালিশটা সরাতেই আর একখানা চিঠি বেরিয়ে এলো। খামের চিঠি খুলে দেখি মাসিমার হাতের লেখা।

বৈশাখের রাত্রি

একটা যায়গায় চোখ পড়তে দেখি লেখা রয়েছে—তুমি এমন করে যে আমাদের মাথা হেঁট করবে তা' কোনো দিনের তরেই বুঝতে পারি নি। হেডমাষ্টার মশায় চিঠি লিখেছেন, তুমি সমস্ত হোস্টেলের ছেলেদের নষ্ট করছ—লেখাপড়া ছেড়ে—সবাই দল বেঁধে তোমার কথায় মারামারি করে বেড়াচ্ছে। তুমি একা নষ্ট হ'য়ে যাও সেইটেই আমি সইতে পাচ্ছি—তার ওপর এতগুলি ছেলে যদি তোমার কথায় অধঃপাতের পথে চলে যায় ত' তাদের বাপ মায়ের দেওয়া অভিশাপে আমার চোখের জল আর সারা জীবনে শুকবে না।

হেডমাষ্টার মশাই আরো জানিয়েছেন—তোমার কথা শুনে ছেলেরা কেউ আর তাঁর কথা শুনছে না—এত বড় একটা দুষ্কৃতির জন্মেই কি আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোমায় মানুষ করেছিলাম ?

পড়াশুনোয় যদি তোমার আর মতি না থাকে—পত্র পাঠ বাড়ী চলে এসো—এমন করে দশের সর্বনাশ আমি তোমায় কিছুতেই করতে দিতে পারবো না.....

চিঠি ছ'খানা পড়ে নির্ঝাক হ'য়ে বসে রইলুম।

নাড়ুর দেশত্যাগের কারণ আমার কাছে জলের মতো সাফ হ'য়ে গেল। ঘুরে ফিরে শুধু এই কথাটাই মনে হ'তে লাগল—হেডমাস্টার এতবড় একটা মহৎ প্রাণের মূল্য যাচাই করতে পারলেন না, তাই না তার উপর এতটা অবিচার করে বসলেন!

আজ শুধু ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ে এই কথাটাই বলতে লাগলুম,—জগদীশ, যারা ওকে দেশ ছাড়া করল—ওকে চিন্তে না পেরে—ওর ওপর অবিচার করে নিজের পাপের বোঝা ভারী করে তুলল—তাদের নাড়ু ক্ষমা করতে পারে কিন্তু তোমার হাত যেন এড়িয়ে না যায়! চোখের জলে চিঠির কাগজের লেখাগুলো ঝাপসা হ'য়ে এলো।

আজ জীবনের চলার পথে অনেকদূর এসে পড়েছি।
দুই আগে এক আমেরিকা ফেরৎ ভ্রমলোকের কাছে

বেপরোয়া

শুনলুম, নাড়ু এখন সেখানকার রামকৃষ্ণ-মঠের সম্পাদক।
✓ তার বেপরোয়া জীবনে সেখানে সে পরশমণির সন্ধান
পেয়েছে।



' ,



